

অচিন্ত্য

ইমামান আহমেদ



অচিনপুর

১. মরবার পর কী হয়	2
২. বাদশা মামার সঙ্গে	8
৩. স্কুলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী	20
৪. ভাদ্রমাসের প্রথমদিকে	29
৫. নবুমামা চলে যাবার পর	33
৬. ঠিকানা নিয়ে কী করবি	38
৭. খুব অর্থকষ্টে পড়লাম	52
৮. অচিনপুরের গল্প	57
৯. রাজশাহী থেকে খবর এল	60
১০. সেই অপূর্ব বৃষ্টিস্নাত রাতে	69
১১. নবুমামার বিয়ের জন্যে	75
১২. টিনের কানেক্টারায় বাড়ি পড়েছে	79
১৩. লিলির যে চিঠির জন্যে	83

১. মরবার পর কী হয়

মরবার পর কী হয়?

আট-ন বছর বয়সে এর উত্তর জানবার ইচ্ছে হল। কোনো গুড় তত্ত্ব নিয়ে চিন্তার বয়স সেটি ছিল না, কিন্তু সত্যি সত্যি সেই সময়ে আমি মৃত্যু রহস্য নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম।

সন্ধ্যাবেলা নবুমামাকে নিয়ে গা ধুতে গিয়েছি পুকুরে। চারদিক ঝাপসা করে অন্ধকার নামছে। এমন সময় হঠাৎ করেই আমার জানিবার ইচ্ছে হল, মরবার পর কী হয়? আমি ফিসফিস করে ডাকলাম,

নবুমামা, নবুমামা!

নবুমামা সাঁতরে মাঝ-পুকুরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন না। আমি আবার ডাকলাম,

নবুমামা, রাত হয়ে যাচ্ছে।

আর একটু।

ভয় লাগছে আমার।

একা একা পাড়ে বসে থাকতে সত্যি আমার ভয় লাগছিল। নবুমামা উঠে আসতেই বললাম, মরবার পর কি হয় মামা? নবুমামা রেগে গিয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা কী বাজে কথা বলিস?

নবুমামা ভীষণ ভীতু ছিলেন, আমার কথা শুনে তাঁর ভয় ধরে গেল। সে সন্ধ্যায় দুজনে চুপি-চুপি ফিরে চলেছি। রাইসুদিন চাচার কবরের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখি, সেখানে কে দুটি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রেখে গেছে। দুটি লিকলিকে ধোয়ার শিখা উড়ছে সেখান থেকে। ভয় পেয়ে নবুমামা আমার হাত চেপে ধরলেন।

শৈশবের এই অতি সামান্য ঘটনাটি আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। পরিণত বয়সে এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ছোট একটি ছেলে মৃত্যুর কথা মনে করে একা কষ্ট পাচ্ছে। এ ভাবতেও আমার খারাপ লাগত।

সত্যি তো, সামান্য কোনো ব্যাপার নিয়ে ভাববার মত মানসিক প্রস্তুতিও যার নেই, সে কেন কবরে ধূপের শিখা দেখে আবেগে টলমল করবে? কেন সে একা একা চলে যাবে সোনাখালি? সোনাখালির খালের বাধানো পুলের উপর বসে থাকতে থাকতে এক সময় তার কাঁদতে ইচ্ছে হবে?

আসলে আমি মানুষ হয়েছি। অদ্ভুত পরিবেশে। প্রকাণ্ড একটি বাড়ির অগুণতি রহস্যময় কোঠা। বাড়ির পেছনে জড়াজড়ি করা বাঁশবন। দিন-মানেই শেয়াল ডাকছে চারিদিকে। সন্ধ্যা হব-হব সময়ে বাশবনের এখানে-ওখানে জ্বলে উঠছে ভূতের আগুন। দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়তে শুরু করছে কানাবিবি। সমস্তই অবিমিশ্র ভয়ের।

আবছা অন্ধকারে কানাবিবির দুলে দুলে কোরান পাঠ শুনলেই বুকের ভেতর ধক্ক করে উঠত। নানিজান বলতেন, কানার কাছে এখন কেউ যেয়ো না গো। শুধু কানাবিবির কাছেই নয়, মোহরের মা পা ধোয়াতে এসে বলত, পুলাপান কুয়াতলায় কেউ যেও না। কুয়াতলায়

সন্ধ্যাবেলায় কেউ যেতাম না। সেখানে খুব-একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল। ওখানে সন্ধ্যাবেলায় যেতে নেই।

চারিদিকেই ভয়ের আবহাওয়া। নানিজানের মেজাজ ভাল থাকলে গল্প ফাঁদতেন। সেও ভূতের গল্প : হাট থেকে শোল মাছ কিনে ফিরছেন তার চাচা। চারদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি পড়ছে। টিপ টপ। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ছেড়ে বাড়ির পথ ধরেছেন, ওমনি পেছন থেকে নাকিসুরে কে চাঁচিয়ে উঠলো, মাঁছটা আঁমারে দিঁয়ে যাঁ।

রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জাগিয়ে এনে ভাত খাওয়াত মোহরের মা। লম্বা পাটিতে সারি সারি থালা পড়ত। ঘুম-ঘুম চোখে ভাত মাখাচ্ছি, এমন সময় হয়ত রূপ করে শব্দ হল বাড়ির পেছনে। মোহরের মা খসখসে গলায় চাঁচিয়ে উঠল,

পেততুনি নাকি? পেততুনি নাকি রে?

নবুমামা প্রায় আমার গায়ের উপর হুমাড়ি খেয়ে চাপা সুরে বলত, ভয় পাচ্ছি, ও মোহরের মা, আমার ভয় লাগছে।

নানাজানের সেই প্রাচীন বাড়িতে যা ছিল সমস্তই রক্ত জমাট-করা ভয়ের। কানাবিবি তার একটি মাত্র তীক্ষ্ণ চোখে কেমন করেই-না তাকাত আমাদের দিকে। নবুমামা ধলত, ঐ বুড়ি আমার দিকে তাকালে কণ্ঠ দিয়ে চোখ গেলে দেব। কানাবিবি কিছু না বলে ফ্যালফ্যালিয়ে হাসত। মাঝেমধ্যে বলত, পুলাপান ডরাও কেন? আমি কিতা? পেত্নী? পেত্নী না হয়েও সে আমাদের কাছে অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল; শুধু আমরা নাই, বড়রা ও তাকে

সমীহ করে চলতেন! আব্বা সমীহ করবে নাই-বা কেন? বড় নানিজানেবা নিজের মুখ থেকে শোনা গল্প।

তার বাপের দেশের মেয়ে কানাবিবি। বিয়ের সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ফাই-ফরমাস খাটে। হেসে-খেলে বেড়ায়। একদিন দুপুরে সে পেটের ব্যথায় মরো-মরো। কিছুতেই কিছু হয় না, এখন-যায় তখন-যায় অবস্থা। নানাজান লোক পাঠিয়েছেন। আশু কবিরাজকে আনতে। আশু কবিরাজ এসে দেখে সব শেষ। বরফের মত ঠাণ্ডা শরীর; খাটিয়ায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঁশ কাটতে লোক গেল। নানিজান মরার মাথার কাছে বসে কোরান পড়তে লাগলেন। অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল ঠিক তখনই-আমার নানিজান ভয়ে ফিট হয়ে গেলেন। নানাজান আতঙ্কে চোঁচিয়ে উঠলেন, ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ! কারণ কানাবিবি সে সময়ে ভাল মানুষের মত উঠে বসে পানি খেতে চাচ্ছে। এর পর থেকে স্বভাব-চরিত্রের আমল পবিবর্তন হল তার। দিনরাত নামাজ-রোজা। আমরা যখন কিছু কিছু জিনিস বুঝতে শিখেছি, তখন থেকে দেখছি, সে পাড়ার মেয়েদের তাবিজকবজ দিচ্ছে; সন্ধ্যা হতে-না-হতেই দোতলার বারান্দায় কুপি জ্বালিয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়ছে। ভয় তাকে পাবে না কেন?

এ তো গেল রাতের ব্যাপার। দিনের বোলা ও কি নিস্তার আছে? গোপা ছুটি খেলতে গিয়ে যদি ভুলে কখনো পূর্বের ঘরের কাছাকাছি চলে গিয়েছি, ওমনি রহমত মিয়া বাঘের মতন গর্জন কলে উঠেছে, খাইয়া ফেলুম। ঐ পোলা, কাঁচা খাইয়া ফেলামু; কচ কচ কচ। ভয়ানক জোয়ান একটা পুরুষ শিকল দিয়ে বাঁধা, ব্যাপারটা ভয়াবহ। বন্ধ পাগল ছিল রহমত মিয়া, নানাজানের নৌকার মাঝি। তিনি রহমতকে স্নেহ করতেন খুব, সারিয়ে তুলতে চেষ্টা ও করেছিলেন। লাভ হয়নি।

এ সমস্ত মিলিয়ে তৈরি হয়েছে আমার শৈশব। গাঢ় রহস্যের মত ঘিরে রয়েছে আমার চারদিক। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অল্প বয়সের ভয়-কাতর একটি ছেলে তার নিত্যসঙ্গী নবুমামার হাত ধরে ঘুমুতে যাচ্ছে, দোতলার ঘরে। নবুমামা বলছেন, তুই ভিতরের জানালা দুটি বন্ধ করে আয়, আমি দাঁড়াচ্ছি বাইরে। আমি বলছি, আমার ভয় করছে, আপনি ও আসেন। মামা মুখ ভেংচে বলছেন, এতেই ভয় ধরে গেল! টেবিলে রাখা হ্যারিকেন থেকে আবছা অ্যালো আসছে। আমি আর নবুমামা কুকুর-কুণ্ডলি হয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে গুয়ে আছি। নবুমামা শুতে-না-শুতেই ঘুম; একা একা ভয়ে আমার কান্না আসছে। এমন সময় বাড়ির ভেতব থেকে হৈচৈ শোনা গেল। শুনলাম, খড়ম পায়ে খটখট করে কে যেন এদিকে আসছে; মোহরের মা মিহি সুরে কাঁদছে, আমি অনেকক্ষণ সেই কান্না শুনে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। জানাতেও পারিনি সে-রাতে আমার মা মারা গিয়েছিলেন।

সে-রাতে আমার ঘুম ভেঙেছিল ফজরের নামাজের সময়। জেগে দেখি, বাদশা মামা চুপচাপ বসে আছেন চেয়ারে। আমাকে বললেন, আর ঘুমিয়ে কি কারবি, আয় বেড়াতে যাই। আমরা সোনাখালির খাল পর্যন্ত চলে গেলাম; সেখানে পাকা পুলের উপর দুজনে বসে বসে সূর্যোদয় দেখলাম। প্রচণ্ড শীত পড়েছিল সেবার। কুয়াশার চাদরে গাছপালা ঢাকা। সূর্যের আলো পড়ে শিশির-ভেজা পাতা চকচক করছে। কেমন অচেনা লাগছে সব কিছু। মামা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, রঞ্জু, আজ তোর খুব দুঃখের দিন। দুঃখের দিনে কি করতে হয় জানিস?

না।

হা হা করে হাসতে হয়। হাসলেই আল্যা বলেন, একে দুঃখ দিয়ে কোনো লাভ নেই। একে সুখ দিতে হবে। বুঝেছিস?

বুঝেছি।

বেশ, তাহলে হাসি দে আমার সঙ্গে।

এই বলে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বাদশা মামার খুব মোটা গলা ছিল। তার হাসিতে চারদিক গম গম করতে লাগল। আমি ও তাঁর সঙ্গে গলা মিলালাম। বাদশা মামা বললেন, আজ আর বাসায় ফিরে কাজ নেই, চল শ্রীপুর যাই। সেখানে আজ যাত্রা হবে। আমি মহাখুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম।

কতদিনকার কথা, কিন্তু সব যেন চোখের সামনে ভাসছে।

২. বাদশা মামার সঙ্গে

বাদশা মামার সঙ্গে আমার কখনো অন্তরঙ্গতা হয়নি। অথচ আমরা একই ঘরে থাকতাম। দোতলার সবচেয়ে দক্ষিণেব ঘরে দুটো খাটের একটিতে বাদশা মামা, অন্যটিতে আমি আর নবুমামা। সারাদিন বাদশা মামার দেখা নেই। রাতে কখন যে ফিরতেন, তা কোনোদিনই জানিনি। ঘুম ভাঙার আগে-আগেই চলে গেছেন। কোনো কোনো বাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছি গুনগুন করে কী পড়ছেন। যেদিন মেজাজ ভালো থাকত সেদিন খুশি-খুশি গলায় বলতেন, রঞ্জু, শুন তো দেখি, কেমন হচ্ছে বলবি। আমি হঠাৎ ঘুম-ভাঙা অবস্থায় কী হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না। মামা দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলা শুরু করেছেন—

এ রাজ্যপাঠ যায় যাক,
কোনো ক্ষতি নেই
কিন্তু ত্রিদিব তুমি
কোথা যাবে?

ভরাট গলা ছিল তার, সমস্ত ঘর কোপে কেঁপে উঠত। মাঝপথে থেমে গিয়ে বলতেন, দাঁড়া, পোশাকটা পরে নেই, পোশাক ছাড়া ভাল হয় না। তোল, নবুকে ঘুম থেকে তোল। নবুমামার ঘুম ভাঙলেই প্রথম কিছুক্ষণ নাকি সুরে কাঁদত। বাদশা মামা বিরক্ত হয়ে বলতেন,—গাধা! দেখ না কী করছি। তারপর দুজনেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকি বাদশা মামার দিকে। আলমারি খুলে তিনি মুকুট বের করেছেন, জড়িদার পোশাক পরেছেন। তারপর একা একাই অভিনয় করে চলেছেন। আমরা দুই শিশু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি।

বাদশা মামা প্রথম থেকেই আমাদের কাছে দূরের মানুষ। যিনি জরির পোশাক পরে রাতদুপুরে আমাদের অভিনয় দেখান, তিনি কাছের মানুষ হতে পারেন না। বাড়ির মানুষের কাছেও তিনি দল-ছাড়া। খুব ছোটবেলায় নানাজান তাকে একবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। যে ছেলে স্কুল পালিয়ে যাত্রাদলে চলে যায়, নানাজানের মতো লোক তাকে ঘরে রাখতে পারেন না। খবর শুনে ছোট নানিজান খাওয়া-দাওয়া ছাড়লেন। মরো-মারো অবস্থা! নানাজান লোক পাঠিয়ে বাদশা মামাকে ফিরিয়ে আনলেন। সেই থেকে তিনি বাদশা মামাকে ঘাটান না! বাদশা মামাও আছেন আপন মনে।

বাদশা মামা আমার শিশুচিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। শিল্পীর সব সময়ই শিশুদের আকর্ষণ করে। হয়ত শিশুরাই প্রতিভার খবর পায় সবার আগে, কিন্তু বাদশা মামা দারুণ অসুখী ছিলেন। যে সামাজিক পদমর্যাদা তার ছিল তা নিয়ে যাত্রাদলের মানুষদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন না। অথচ তাঁর চিন্তা-ভাবনার সমস্ত জগৎ যাত্রাদলকে ঘিরে। মাঝে-মাঝেই তাঁকে দেখেছি, বারান্দায় চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে আছেন। যদি গিয়ে বলেছি,

মামা কি করেন?

কিছু না।

সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়েছে, মামা তেমনি বসেই আছেন। কেউ যদি গিয়ে বলেছে,

বাদশা, তোর কি হয়েছে রে?

কিছু না।

মাঝে-মাঝেই এ রকম হত তাঁর। নানাজান তখন ক্ষেপে যেতেন। ছোট নানিজনকে ডেকে বলতেন, ভং ধরেছে নাকি? শক্ত মুগুড় দিয়ে পিটালে ঠিক হয়, বুঝেছ? নানিজন মিনমিন করে কী কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করেন। তারপর একসময় দেখা যায়, তিনি বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছেন।

নানাজানকে সবাই ভয় করতাম আমরা। দোতলা থেকে একতলায় তিনি নেমে এলে একতলা নীরব হয়ে যেত। খুব কম বয়সী শিশু, যাদের এখনো বিচার-বুদ্ধিও হয়নি, তারাও নানাজানকে দেখলে ফ্যাকাসে হয়ে যেত। ভয়টাও বহুলাংশে সংক্রামক।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙত নানাজানের কোরান পাঠের শব্দে। মোটা গলা, টেনে টেনে একটু অনুনাসিক সুরে অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। তখন মাথায় থাকত লাল রংয়ের বুটি ওয়ালা একটা ফেজ টুপি। খালি গা, পরনে সিল্কের ধবধবে সাদা লুঙ্গি। হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে বুকো বুকো অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। পড়া শেষ হয়ে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতেন। ছোট নানিজন এই সময়ে জাম-বাটিতে বড় এক বাটি চা তৈরি করে নিয়ে যেতেন। নানাজান চুকচুক করে অনেকটা সময় নিয়ে চা খেতেন। তারপর নিজের হাতে হাঁসের খোয়াড় খুলে দিতেন। পাশেই মুরগির খোয়াড়, সেটিতে হাতও দিতেন না। হাঁসগুলি ছাড়া পেয়ে দৌড়ে যেত পুকুরের দিকে। তিনিও যেতেন পিছু পিছু। সমস্তই রুটিন বাধা, একচুলও এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

কিছু কিছু মানুষ ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়ে, আবার কারো কারো কাছে ভাগ্য আপনি এসে ধরা দেয়। নানাজান এ দুটির কোনোটির মধ্যেই পড়েন না। পূর্বপুরুষের গড়ে যাওয়া

সম্পদ ও সম্মানে লালিত হয়েছেন। কিন্তু অসংযমী হননি। অহংকার ছিল খুব, সে অহংকার প্রকাশ পেত বিনয়ে। হয়ত কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে বেড়াতে; নানাজান ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বার বার বলছেন, গরিবের ঘরে এসেছেন, কী দিয়ে খেদমত করি, বড়ো সরমিন্দায় পড়লাম, বড়ো কষ্ট হল আপনার; ওরে তামুক আন, আর খাসি ধর দেখি একটা ভাল দেখে। যিনি এসেছেন, আয়োজনের বাহুল্য দেখে তিনি লজ্জায় পড়ে যেতেন।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের দেখা চিত্র। স্মৃতি থেকে লিখছি। সে স্মৃতিকে বিশ্বাস করা চলে। আমরা যারা ছেলে-ছোকড়ার দলে, তাদের প্রতি নানাজানের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। একা একা থাকতেন। সারাক্ষণই। বড়ো নানাজান তো কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতস্থই ছিলেন। তিনি দোতলা থেকে নামতেন। কালে-ভদ্রে। ছোট নানাজানও যে কখনো হালকা সুরে নানাজানের সঙ্গে আলাপ করছেন, এমন দেখিনি। খালারাও আমাদের মত দূরে দূরে থাকতেন। ক্ষমতাবান লোকরা সব সময়ই এমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে যায়।

কেন জানি না, আমার নিজের খুব ইচ্ছে হত নানাজানের সঙ্গে ভাব করি। ঘুমোতে যাবার আগে কতদিন ভেবেছি, নানাজান যেন এসে আমাকে বলছেন, আয় রঞ্জু বেড়াতে যাই। আমি তার হাত ধরে চলেছি বেড়াতে। কতদিন ভেবেছি আজ ঘুম থেকে উঠেই নানাজানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি। ঘুম ভাঙতেই তাড়া পড়েছে, ওজু করে পড়তে যা, ওজু করে পড়তে যা। মৌলভী সাহেব বসে আছেন বাইরের ঘরে। আমরা সবাই আমপারা হাতে করে একে একে হাজির হচ্ছি। মেয়েরা ডান পাশে, ছেলেরা বাঁপাশে। সমবেত কণ্ঠে অ্যাওয়াজ উঠছে, আলিফ দুই পেশ উন, বে দুই পেশ বুন। নাশতা তৈরি হওয়া মাত্র আরবি

পড়া শেষ। তারপর ইংরেজি, বাংলা আর অংকের পড়া। পড়াতে আসতেন রাম মাস্টার। ভারি ভাল মাস্টার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। নবুমামা ছাড়া বনিয়েছিলেন-

রাম মাস্টার বুড়া
এক পা তার খোঁড়া

স্কুলে যাবার আগ পর্যন্ত পড়াতেন তিনি। তার কাছে পড়ত শুধু ছেলেরাই। মেয়েদের আরবি ছাড়া অন্য কিছু পড়বার প্রয়োজন ছিল না। তারা ঘরের কাজ করত, জরি দিয়ে লতা-পাতা ফুল বানাত, বালিশের ওয়াড়ে নকশা তুলে লিখত, ভুল না আমায়। রাম মাস্টার চলে যেতে যেতে স্কুলের বেলা হয়ে যেত। স্কুল শেষ হয়ে গেলে তো খেলারই পাঠ। সূর্য ডুবে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত চলত হৈ হৈ। ফুরসত ফেলার সময় নেই। এর মধ্যেই লিলি এসে আমাকে নিয়ে যেত বাড়ির ভেতর। সে নিজেকে সব সময় ভাবত আমার একজন অভিভাবক। সে যে আমার বড়বোন এবং নানাজানের এই প্রকাণ্ড বাড়িতে আমিই যে তার সবচেয়ে নিকটতম জন, তা জানাতে তার ভারি আগ্রহ ছিল।

শাড়ি-পরা তার হালকা-পাতলা শরীর কোনো ফাঁকে আমার নজরে পড়ে গেলেই মন খারাপ হয়ে যেত। অবধাবিতভাবে সে হাত ইশারা করে আমায় ডাকবে। ফিসফিস করে বলবে, কাল সবাই দুখান করে মাছ ভাজা খেয়েছে, আর তুই যে মোটে একটা লিলি।

একটাই তো দিয়েছে আমাকে।

বোকা কোথাকার। তুই চাইতে পারলি না? আর দুধ দেবার সময় বলতে পারিস না, আরেক হাতা দুধ দাও মোহরের মা?

দুধ ভাল লাগে না আমার ।

ভাল না লাগলে হবে? স্বাস্থ্য ভাল করতে হবে না? বেকুব কোথাকাব ।

এই বলে সে হয়ত কাঁচা-মিঠা গাছের আমি এনে দিল আমার জন্য । আবার কোনোদিন হয়ত ডেকে নিয়ে গেল বাড়ির পেছনে । আগের মতো গলা নেমে গেছে খাদে । ফিসফিস করে বলছে, কি ভাবিস তুই, আমরা কী ফ্যালনা? বড় নানীজানের সম্পত্তির অংশ পাব না । আমরা? নিশ্চয়ই পাব । বড় নানীজানের মেলা সম্পত্তি । আর আমাদের মা হচ্ছে তার একমাত্র মেয়ে । আমরা দুজনেই শুধু ওয়ারিশান । বুঝলি?

হ্যাঁ, বুঝেছি ।

কাঁচকলাটা বুঝেছিস । হাদার বেহদ তুই । ছিঃ ছিঃ, এতটুকু বুদ্ধিও নেই । নে, এটা রাখা তোর কাছে ।

তাকিয়ে দেখলাম চকচকে সিকি একটা ।

কই পেয়েছে?

আমার ছিল বলেই লিলি আবার ফিসফিস করে বলল,

দেখিস আবার, গাধার মত সবাইকে বলে বেড়াবি না ।

না, বলব না।

লিলিব ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, পয়সাটা অন্যভাবে জোগাড় করেছে সে। আমরা দুভাইবোন কখনো হাতে পয়সা পেয়েছি, এমন মনে পড়ে না। অল্প বয়সে স্নেহটাকে বন্ধন মনে হত না। চাইতেই যা পাওয়া যায় তা তো সব সময়ই মূল্যহীন।

লিলিকে ভাল লাগত কালে-ভদ্রে। যেদিন সে খেয়ালের বসে সামান্য সাজ করে লজ্জা-মেশানো গলায় আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে যেত, সেদিন তাকে আমি সত্যি সত্যি ভালবাসতাম। কিংবা কে জানে অল্প বয়সেই হয়ত করুণা করতে শিখে গিয়েছিলাম। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নাক-মুখ অল্প লাল করে বলত,

আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, তুই থাকবি আমার সঙ্গে?

কবে বিয়ে?

হবে শিগগির।

তারপরই যেন নেহায়েত একটা কথার কথা এমনভাবে বলে বসত, দেখ তো রঞ্জু, শাড়িতে আমাকে কেমন মানায়?

ভাল।

কিন্তু আমার নাকটা যে একটু খ্যাবড়া।

এ বাড়ির কাউকেই লিলি দেখতে পারত না। ভেবে পাই না কেমন করে এত হিংসা পুষে সে বড় হয়েছে। আমি ছাড়া আর একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে তার অল্পবিস্তর খাতির ছিল। তিনি আমাদের বড় নানীজান। বড় নানীজান থাকতেন দোতলায় বাঁদিকের সবচেয়ে শেষের ঘরটায়। অন্ধকার ছোট একটি কুঠুরি। জানালার সামান্য যে ফাঁক দিয়ে আলো-বাতাস আসে, তাও গাবগাহের ঝাঁকড়া ডালপালা অন্ধকার করে রেখেছে। আলো-বাতাসহীন সেই অল্প পরিসর ঘরে বড় নানীজান রাতদিন বসে আছেন। দেখে মনে হবে, নানাজানের দেড়গুণ বেশি বয়স। সমস্ত মাথায় চুল পেকে ধবধব করছে। দাঁত পড়ে গাল বসে গেছে। নিচের মাড়িতে একটি মাত্র নোংরা হলুদ দাঁত। মাঝে-মধ্যে তিনি রেলিং ধরে কাঁপা কাঁপা পায়ে নিচে নেমে আসতেন। কি ফুটি তখন আমাদের! সবাই ভিড় করেছি তার চারপাশে। নানীজান মস্ত একটি মাটির গামলায় দুপয়সা দামের হলুদ রঙের হেনরী সাবান গুলে ফেনা তৈরি করেছেন। ফেনা তৈরি হলেই ঢালাও হুকুম—মুরগি ধইরা আন। মুরগি ধরে আনবার জন্য ছোট্টাছুটি পড়ে যেত আমাদের মধ্যে। সব মুরগি নয়, শুধু ধবধবে সাদা মুরগি ধরে আনবার পালা। নানীজান সেগুলিকে সাবান-গোলা পানিতে চুবিয়ে পরিষ্কার করতেন। পাশেই বালতিতে নীল রঙ গোলা থাকত। ধোয়া হয়ে গেলেই নীল রঙ-এ চুবিয়ে ছেড়ে দেয়া। কি তুমুল উত্তেজনা আমাদের মধ্যে।

টগরের সঙ্গে যখন গল্প করলাম। সে নিচের ঠোট উল্টে দিয়ে বলল, এত মিথ্যে কথাও তোমার আসে? ছিঃ ছিঃ!

মিথ্যে নয় বলে তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না। বড় নানীজনকে নিয়ে কত বিচিত্র সব গল্প আছে। তাঁর ভূতে পাওয়ার গল্পটিও আমি টগরকে শুনিয়েছিলাম।

বড় নানীজনের অভ্যাস ছিল, সন্ধ্যাবেল পুকুরে সাঁতার কেটে নাওয়া। তখন কার্তিক মাস। অল্প-অল্প হিম পড়েছে। নানীজান গিয়েছেন অভ্যেসমত গোসল সারাতে। সূর্য ডুবে অন্ধকার হল, তার ফিরবার নাম নেই। মোহরের মা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পুকুরঘাটে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, কোমর-জলে দাঁড়িয়ে তিনি থর থর করে কাপছেন। মোহরের মা ভয় পেয়ে বলল, কি হয়েছে গো?

নানীজান অস্পষ্টভাবে টেনে টেনে বললেন, ও মোহরের মা, টেনে তোল আমাকে, আমি উঠতে পারি না, কত চেষ্টা করলাম উঠতে।

টগর বলল, হিস্টরিয়া ছিল তোমার নানীর। ভূত-ফুত কিছু নয়। তোমার বড় নানীজানের। ছেলেমেয়ে হয়নি নিশ্চয়ই।

না, হিস্টরিয়া ছিল না তার। আর ছেলেমেয়ে ছিল না, তাও নয়। বড় নানীজনের একটি মাত্র মেয়ে ছিল, হাসিনা। সবাই ডাকত হাসনা। তিনি আমার আর লিলির মা।

হাসনা তিন মাসের একটি শিশুকে কোলে করে আর চার বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে এ বাড়িতে এসে উঠেছিল। কোনো একটি বিশেষ ঘটনার কাল্পনিক চিত্র যদি অসংখ্যবার আঁকা যায়, তাহলে এমন একটি সময় আসে যখন সেই কাল্পনিক চিত্রকেই বাস্তব বলে ভ্রম হয়। আমি মাধ। এ বাড়িতে আসার ঘটনাটি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রতিটি ডিটেল অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হ্যারিকেন আর কুপি মিলিয়ে পনেরো-বিশটি বাতি জ্বলছে এখানেওখানে। বিল থেকে ধরে আনা মাছের গাদার চারপাশে বলে বউ-ঝিরা মাছ কুটিছেন আর হাসিতামাশা করছেন। হাসনা এল ঠিক এ সময়ে। অত্যন্ত জেদী ভঙ্গিতে সে উঠোনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখতে পেয়ে সবাই অবাক হয়ে নেমে এল উঠোনে। খড়ম খট খট করে নানাজান নেমে এলেন দোতলা থেকে আর হাসনা শুকনো চোখে দেখতে লাগল সবাইকে।

হাসনার বিয়েতে সারা গাঁর দাওয়াত ছিল। হিন্দুরা মুসলমান বাড়িতে এখন ইচ্ছে করে মাংস খেতে আসেন, তখন আসতেন না। হিন্দুদের জন্যে ঢালাও মিষ্টির ব্যবস্থা। নাম-করা কারিগর রমেশ ঠাকুর দু'দিন আগে বাড়িতে ভিয়েন বসালেন।

আত্মীয়-কুটুম্বের জায়গা হয় না ঘরে, নতুন ঘর উঠল এদিকে-ওদিকে। গাঁয়ের দারোগা খেতে এসে আঁৎকে উঠে বলল, করছেন কি খান সাহেব? এ যে রাজরাজাদের ব্যাপার! নানাজান হাসিমুখে বললেন, প্রথম মেয়ের বিয়ে, সবাইকে না বললে খারাপ দেখায়, সবাই আত্মীয়-স্বজন।

গ্রামের নিতান্ত গরিব চাষীও মেয়ের বিয়েতে দুবিঘা জমি বিক্রি করে ফেলে, হালের গুরু বেঁচে দেয়। আর নানাজান তখন টাকার উপর শুয়ে।

হাতি আনতে লোক গেল হালুয়াঘাট। সেখানে কালুশেখের দুটি মাদী হাতি আছে। বন থেকে-কাঠের বোঝা টেনে নামায়। বিয়ের আগের রাতে মাল্লতকে ঘাড়ে করে মাতৃ এসে দাঁড়াল। উৎসাহী ছেলেমেয়েরা কলাগাছের পাহাড় বানিয়ে ফেলল উঠোনে। মাল্লতের সঙ্গে

দুদগু কথা বলার জন্য কী আগ্রহ সবার। মাহত সাহেব কী একটু তামাক খেতে ইচ্ছে করবেন?

হাতির পিঠে চড়ে বর এসে নামল। লোকে লোকারণ্য। ভিড়ের চাপে গেট ভেঙে পড়ে, এমন অবস্থা। জরীর মালায় বরের মুখ ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কলম পড়ানোর আগে জরীর মালা সরানো হবে না। সে-ও রাত একটার আগে নয়। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে বর বন্ধুদের নিয়ে সিগারেট খেতে গেল বাইরে। আমনি হৈ-হৈ করে উঠল। সবাই, দেখেছি! কী রঙ! যেন সাহেবদের রঙ। রাজপুত্র এসে দাঁড়িয়েছে যেন!

লিলিরও বিয়ে হল এই বাড়িতে। দশ-পনের জন বন্ধু নিয়ে রোগামত একটি ছেলে বসে রইল বাইরের ঘরে। নিতান্ত দায়সারা গোছের বিয়ে। ভাল ছেলে পাওয়া গেছে, এই তো ঢের। তাছাড়া গয়না-টয়নাও তো নেহায়েত কম দেওয়া হয়নি। মায়ের গলার হার, হাতের ছ'গাছা চুরি, নানীজান দিলেন কানের দুল, ছোট নানীজান নাম-লেখা আংটি। কবুল বলতে গিয়ে লিলি তবু কেঁদে-কেটে অস্থির। নানাজানের প্রবল ধমকের এক ফাঁকে কখন যে কবুল বলেছে তা শুনতেই পেল না কেউ।

ন'মাইল পালকি করে গিয়ে ট্রেন। ট্রেন পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়ে আসব আমি আর নবুমামা। বেডিংপতর নিয়ে দুজন কমলা আগে আগে চলে গিয়েছে। পালকির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারি না, বারবার পিছিয়ে পড়ি। নবুমামা বললেন, পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, আমি জুতা খুলে ফেললাম।

সজনিতলা এসে পান্নি থামল। বেহারারা জিরোবে। পান-তামুক খাবে। লিলি পালকির ফাঁক থেকে হাত বাড়িয়ে ডাকল, এই রঞ্জু, দুষ্টামি করবি না তো?

না।

আমার জন্য কাঁদবি না তো?

না, কাঁদব না।

কাঁদবি না কী রে গাধা? বোনের জন্য না কাঁদলে কার জন্য কাঁদবি? আমার কী আর কেউ আছে?

ট্রেন ছেড়ে দিল।

এই বাড়ি ঐ বাড়ি করে ট্রেন দ্রুত সরে যাচ্ছে। নবুমামা কাঁদছেন হু হু করে। বেহার এসে বলল, দুজনে এসে বসেন পালকিতে, ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

লিলিকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে এসে আমার বয়স যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল। মনে হল কিছু কিছু চিরন্তন রহস্য যেন বুঝতে পারছি।

৩. স্কুলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

আশ্বিন মাস আসতেই সাজ সাজ পড়ে গেল স্কুলে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। গান, তো হবেই, সেই সঙ্গে নাটক হবে স্টেজ বেঁধে। হিরণ্য রাজা নাটকের নাম। হিরণ্য রাজার পাঠ করেছেন বাদশা মামা। উৎসাহের সীমা নেই। আমাদের। খালারাও ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলেন নাটক দেখবার জন্যে। মেয়েদের জন্যে পর্দাঘেরা আলাদা জায়গা করা হয়েছে। এ বাড়ির মেয়েরা আগে কখনো নাটক-ফাটক কিছুই দেখেনি। দেখবার সখ খুব। ছোট নানী আর্জি নিয়ে গেলেন নানাজনের কাছে।

এ সব কি দেখবে! না, না। বলে প্রথম দিকে প্রবল আপত্তি তুললেও শেষের দিকে তাকে কেমন নরম মনে হল। সুযোগ বুঝে নানীজান বলে চলেছেন, একদিনের মোটে ব্যাপার। আমোদ-আহাদ তো কিছু করে না।

না করে না, রাতদিনই তো আমোদ চলছে। আচ্ছা যাক। পালকি করে যেন যায়।

স্কুলঘরে স্টেজ সাজানো হয়েছে। হ্যাঁজাকের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। হ্যাঁরিকেন হাতে নিয়ে গ্রামের লোকজন আসছে। কাতারে কাতারে। পর্দায় আড়াল করা মেয়েদের জায়গায় তিল ধারনের ঠাই নেই। আমি আর নবুমামা বসেছি মেয়েদের সঙ্গে। ছোট নানী আর দুখালা চাদর গায়ে চুপচাপ বসে আছেন। নাটক শুরু হতে হতে রাত হয়ে গেল। বাদশা মামা সেজেছেন হিরণ্য রাজা। এমন মহান রাজা দীন-দুঃখীদের জন্য সমস্ত বিলিয়ে দিচ্ছেন। দুশ্চরিত্র মন্ত্রি ঘোট পাকাচ্ছে তলে তলে। রাজা আপন-ভোলা মানুষ, কিছু জানতেও পারছেন না। মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছি সবাই। এক সময় হিরণ্য রাজা মনের দুঃখে

রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। রানীও তাঁর পিছু পিছু। নানীজান চমকে বললেন, মেয়ে কোথেকে এলো। কার মেয়ে?

ও হচ্ছে হারু দাদা, মেয়ে সেজেছে।

ওমা, হারু নাকি?

নানীজনের চোখে আর পলক পড়ে না। বিবেকের পাঠ করল আজমল। খালারা কাঁদতে কাঁদতে চাদর ভিজিয়ে ফেলল। শেষ দৃশ্যে হিরণ্য রাজা মন্ত্রীকে বলছেন—এই রাজ্য তুমি লাও ভাই। কাজ নাই রাজ্যপাটে, আমি বনবাসে যাব।

সেইখানে শান্তি অপার।

ছোট খালা বললেন, বেকুবটা মন্ত্রীকে মেরে ফেলে না কেন?

মন্ত্রী বলছে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হোক রাজা, বৃথা তর্কে কোনো ফল নাই।

ঝন ঝন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। নবুমামা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। নানীজান পেছনে থেকে চেঁচাচ্ছেন, ও নবু বস, দেখতে পাচ্ছি না। বসে পড়। কী তীব্র উত্তেজনা! রাজার মৃত্যুতে চোখে জল। বাদশা মামার জয়জয়কার। কী পাঠাটাই না করলেন!

নানাজানও যে শেষ পর্যন্ত অভিনয় দেখবেন, তা কেউ ভাবিনি। পালকিতে খালারা উঠতে যাবে, এমন সময় তিনি এসে হাজির। বাদশা তো বড় ভালো করেছে। এই বলে পালকিতে

উঠবার তাড়া দিয়ে তিনি চলে গেলেন হেডমাস্টার সাহেবের বাড়ি। সেখানে তার রাতের দাওয়াত।

বাড়ি গিয়ে দেখি মেহমানে বাড়ি ভর্তি। নন্দিপুর থেকে নানাজানের ফুপাতো বোন এসেছেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে। সকাল-সকালই পৌঁছতেন, নৌকার দাঁড় ভেঙে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেছে। আমি আর নবুমামা অবাক হয়ে গেলাম মেহমানদের মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর একটি মেয়েকে দেখে। নানাজানের ফুপাতো বোনের বড় মেয়ে। ডাকনাম এলাচি। এমন সুন্দরও মানুষ হয়।

দু'মাসের ভেতর এলাচির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বাদশা মামার। আপাত কার্যকারণ ছাড়াই যে সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটে তা-ই কেমন করে পরবর্তী সময়ে মানুষের সমস্ত জীবন বদলে দেয়, ভাবতে অবাক লাগে।

সে রাতে নাটক দেখে সবাই বাদশা মামার উপর মহাপ্রসন্ন ছিলেন। বাড়ি এসে দেখেন, ফুলের মত একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাদশার সঙ্গে এর বিয়ে হলে কেমন হয়? এই ভাবনা চকিতে খেলে গেল সবার মনে। এলাচি স্থায়ীভাবে নানাজানের বাড়িতে উঠে এলেন। নাম হয়ে গেল। লাল বউ, আমি ডাকতাম লাল মামি, নবুমামা ডাকত লাল ভাবী। টকটকে বর্ণ, পাকা ডালিমের মত গাল। আর কি নামেই-বা ডাকা যায়!

নবুমামা এবং আমি দুজনে একইসঙ্গে লালমামির প্রেমে পড়ে গেলাম! সদা ঘুর ঘুর করি, একটু যদি ফুট-ফরমাস করতে দেন এই আশায়। লালমামি কাকে বেশি খাতির করেন, আমাকে, না নবুমামাকে এই নিয়ে ঝগড়া হয়ে যায় দুজনের। স্কুলে যাবার পথে বইখাতা নামিয়ে হয় হাতাহাতি। লালমামির বড়ই খাবার ইচ্ছে হয়েছে, খেলা বন্ধ করে দুজনেই

ছুটেছি ইন্দু সাহার বাড়ি। ইন্দু সাহার বাড়িতে দুটি বড়ই গাছ, মিষ্টি যেন গুড়। লালমামির ইচ্ছে হয়েছে কামরাঙ্গা খাবেন, ঝাল লংকা মাথিয়ে। বাড়ির পেছনে বিস্তৃত বন। এখানে-ওখানে গাছ আছে লুকিয়ে। দুজনেই গেছি বনে।

মেয়েরা খুব সহজেই ভালবাসা বুঝতে পারে। লালমামি আমাদের দুজনকেই বুঝে ফেললেন। পোষা বেড়ালের মত আমরা তার সঙ্গে বেড়াই। মোহরের মা বলে, পুলা দুটা মাইয়া স্বভাবের, এসব ভাল না গো।

আমি আর নবুমামা তখন নির্বাসিত হয়েছি পাশের ঘরে। কতটুকুই বা দূরে? লালমামি হাসছেন, আমরা শুনতে পারছি। লালমামি বলছেন, উঁহু, চুল ছিঁড়ে গেল। আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। লালমামি যদি কখনো বলেছেন, এই যা, আজ খাওয়ার পানি-আনি নাই, ওমনি নবুমামা তড়াক করে লাফিয়ে পড়েছে বিছানা ছেড়ে, ভাবী, পানি নিয়ে আসছি আমি।

একঘেয়ে কোনো আকর্ষণেই আকর্ষণ থাকে না। মায়ের প্রতি মানুষের অন্ধ ভালবাসা ফিকে হয়ে আসে একঘেয়েমির জন্যেই। ভাই-বোনের ভালবাসার ধরনও বদলাতে থাকে। লালমামির প্রতি আমাদের ভালবাসা ফিকে হওয়ার কোনো ভয় ছিল না। তার মত বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে আমি পরবর্তী জীবনে আর একটিমাত্র দেখেছিলাম।

যে কথা বলছিলাম-লালমামি আমাদের বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করলেন। হয়ত আমি আর নবুমামা দুজনে বসে আছি তাঁর ঘরে। মামি হুকুম করলেন, নবু, দরজা বন্ধ করে দে। খোল, এবার আলমারি খোল। রাজার পোশাকটা বের করত।

আমি আঁৎকে উঠে বলেছি, বাদশা মামা মেরে ফেলবে। ঠোঁট উল্টে মামি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করেছেন, নে, তুই এই মুকুটটা পরে ফেলে। নবু, তুই কী সাজবি, সন্ন্যাসী?

নবুমামা বললেন, তুমি কী সাজবে আগে বল?

আমি রানী সাজব।

তাহলে আমি রাজা সাজব। ততক্ষণে আমি ঢলঢলে মুকুটটা মাথায় পরে ফেলেছি। তারস্বরে চৈঁচাচ্ছি, না, আমি রাজা সাজব।

মামি বললেন, যুদ্ধ হোক দুজনার মধ্যে। যে জিতবে, সেই রাজা। কথা শেষ না হতেই নবুমামা ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমার উপর। দুজন ধুলোমাখা মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে থাকি। যেন এই যুদ্ধে জীবন-মরণ নির্ভর করছে। আল্লাহ জানেন, নবুমামা এই লিকলিকে শরীরে এত জোর পান কী করে?

জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতে দীর্ঘ সময় লাগে। মুখে নখের রক্তাভ আঁচড়ে, ধূলি-ধূসরিত শার্ট নিয়ে যখন যুদ্ধজয়ী রাজা দাঁড়ান। তখন মামি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেন, আজ আর না, আজ থাক, যা, তোরা আমার জন্য তেঁতুল নিয়ে আয়।

বল তো তুই, টানলে ছোট হয় কোন জিনিস?

লালমামি বিছানায় শুয়ে পা দোলাতে দোলাতে বলেন। হাজার চিন্তাতেও মাথায় সে জিনিসটার নাম আসে না, টানলে যা ছোট হতে থাকে।

পারলি না? দেশলাই আন আমি দেখাচ্ছি।

নবুমামা দৌড়ে দেশলাই নিয়ে আসেন। মামি আমাদের দুজনের স্তম্ভিত চোখের সামনে ফস করে একটা বার্ডসাই সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকেন। কোন ফাকে জানি বাদশা মামার কাছ থেকে জোগাড় করে রেখেছিলেন। আমাদের দুজনের নিঃশ্বাস পড়ে না। মামি বলেন, এই দেখ, যতই টানছি, ততই ছোট হচ্ছে। আমরা হা করে তাকিয়ে থাকি মামির দিকে। মামি আধা-খাওয়া সিগারেট বাড়িয়ে ধরেন আমাদের দিকে, শান্ত গলায় বলেন, নে এবাব তোরা টান। হা করে দেখছিস কি? কসে টান দে। নাইলে তো বাড়িতে বলে দিবি। মামির মুখেব গন্ধ দূব করবাব জন্যে পানি আনতে হয়, এলাচ দানা আনতে হয়। সেই সঙ্গে মামির প্রতি আমাদের এক নিষিদ্ধ আকর্ষণ জড় হতে থাকে।

বাড়ির বউ-ঝিরা লালমামিকে বিষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। এ কেমন ধারা বউ? লাজ নেই, সহবত নেই।

কোথায় শাশুড়ীকে দেখে একহাত ঘোমটা দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তা নয়, টগবগিয়ে ঘোড়ার মত চলে যায়। নতুন বউ রান্নাঘরে গিয়ে বসুক না দুদণ্ড। ননদের হাত থেকে আনাজ নিয়ে জোর করে কুটে দিক, তা নয়, গলায় বাঁশ দিয়ে হাসছে হিহিহিহি। মোহারের মা সময় বুঝে ছড়া কাটে। —

“রূপ আর কয়দিনের?

নিমতা ফুল যায়দিনের।”

নিমতা ফুল সন্ধ্যা বেলাতেই ফোটে, রোদ একটু উঠতেই ঝর ঝর করে ঝড়ে পড়ে। কিন্তু যার জন্যে বলা সে শুনছে কই? শাশুড়ি মুখের ওপর কিছু বলেন না। লোকে বলবে, বউ কাটকী শাশুড়ী। কী লজ্জার কথা!

একমাত্র চাবিকাঠি বাদশা মামা। সে-ই তো পারে বউয়ের রীতিনীতি শুধরে দিতে। কিন্তু দেখে শুনে মনে হয়, বউ জাদু করেছে বাদশা মামাকে।

বিয়ের পর পরই বাদশা মামা ভয়ানক বদলে গেছেন। চাল-চলনে, কথা-বার্তায় ভয়ানক অস্থিরতা এসেছে। আগে সমস্ত দিন বাইরে পড়ে থাকতেন। রাতের বেলা খেতে আসতেন, বাড়ির সঙ্গে এইটুকুই যা সংযোগ। এখন সমস্ত দিন বাড়িতে থাকেন। কিন্তু সে-ও অন্যরকম থাকা। হয়ত মিনিট খানিকের জন্যে লাল মামির ঘরে এসেছেন, চোখে-মুখে ব্যস্ততার ভার। যেন কোনো দরকারী জিনিস খুঁজে পাচ্ছেন না। লাল মামি ভ্র কুঁচকে বললেন, কি চাও?

কি না, কিছু না।

বলে মামা বিব্রত ভঙ্গিতে চলে গেলেন। বসে রইলেন বাইরের ঘরে একা একা। আবার হয়ত আসলেন কিছুক্ষণের জন্যে, আবার বাইরে গিয়ে বসে থাকা। নানীজান একদিন বললেন— বাদশা, কী হয়েছে রে?

বাদশা মামা কিছু বললেন না। ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সবাই অবাক হল, যেদিন বাদশা মামা কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেলেন। নানাজান সে দিনই প্রথম লালমামির ঘরে এসে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এলাচি বাদশার কী হয়েছে?

লালমামি চুপ করে রইলেন। নানাজান বললেন, তোমাদের মিল হয় না কেন? কি ব্যাপার?

মামি চুপ করে রইলেন। নানাজান শান্ত গলায় বললেন, এলাচি, সরফরাজ খানের বাড়িতে কোনো বেচাল হয় না। খেয়াল থাকে যেন।

নানাজান বেরিয়ে এসে ছোট নানীজনকে কিছুক্ষণ বকে নিচে নেমে গেলেন। সারাদিন বাড়ি থম থম করতে লাগল। সে সন্ধ্যায় কানাবিবি যখন সাপ-খেলানো সুরে কোরান পড়তে শুরু করল তখন কেন জানি না। ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল।

তৃতীয় দিনের দিন সকালবেলা বাদশা মামা ফিরে এলেন। ভেতরের বাড়িতে না এসে বাইরের ঘরে বসে রইলেন। নানীজান এসে তাকে নিয়ে গেলেন ভেতর বাড়িতে। নানা সারক্ষণই সংকুচিত হয়ে রইলেন। যখন লালমামির সঙ্গে তার দেখা হল তিনি ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন।

সবচেয়ে অবাক হওয়ার ব্যাপারটি হল রাতে। বাদশা মামা লালমামির ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। মামি বললেন, কে?

বাদশা মামা নিশ্চাণ গলায় বললেন, আমি।

এদিকে পাশের ঘরে আমি আর নবুমামা কান খাড়া করে বসে আছি। কিন্তু আর কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। বাদশা মামা নিচু গলায় বললেন, দরজাটা খোল।

লালমামি কোনো সাড়া-শব্দ করলেন না। শেষ পর্যন্ত বাদশা মামা আমাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমরা তিনজন একথাটে শুয়ে রইলাম। মামা বার বার বলছেন, কাউকে বলবি না, খবরদার।

না!

বললে কান ছিঁড়ে ফেলব। দুজনের মনে থাকে যেন।

৪. ভাদ্রমাসের প্রথমদিকে

ভাদ্রমাসের প্রথমদিকে নবুমামা অসুখে পড়লেন, কালান্তক ম্যালেরিয়া। হাত-পা শুকিয়ে কাঠি, পেট ফুলে ঢোল। উঠোনে ছেলেমেয়ের হুল্লোড় করে বেড়ায়, নবুমামা চাদর গায়ে দিয়ে জলচৌকিতে বসে বসে দেখে। ম্যালেরিয়ার তখন খুব ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। গাঢ় হলুদ রঙের কুইনাইন ট্যাবলেট। সেকালের এক পয়সার মত বড়ো, আস্ত গেলা যায় না। গলায় আটকে থাকে। সপ্তাহে একদিন খাবার নিয়ম, ম্যালেরিয়া হোক আর না-হোক। ওষুধ খেলেই কান ভো ভো করত, মাথা হাঙ্কা হয়ে যেত।

কুইনাইন খেয়ে খেয়ে এসময় নবুমামার জ্বর সারল। শরীর খুব দুর্বল। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না। মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান করে, এটা খাবে, ওটা খাবে। খিটখিটে মেজাজ। যদি কোনো কারণে লালমামি আমার দিকে তাকিয়ে হোসেছেন, অমনি তার রাগ হয়ে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসছ কেন? আমার দিকে তাকিয়ে হাস। শুনে লালমামি নিষ্ঠুরের মত বলে বসেন, তোর দিকে তাকিয়ে হাসব কি রে, তুই তো চামচিকা হয়ে গেছিস।

নবুমামার আকাশ-ফাটানো কান্না থামবার জন্যে লালমামিকে অনেকক্ষণ নবুমামার দিকে তাকিয়ে হাসতে হয়। স্বাস্থ্যের জন্যে নবুমামার স্কুলে যাওয়াও বন্ধ। রোগা শরীর পেয়ে বিভিন্ন রোগ ইচ্ছে মত হেঁকে ধরেছে, আজ সর্দি তো কাল জ্বর, পরশু পেট নেমেছে।

কানাবিবিবির দেওয়া তাবিজের ঝোলা গলায় দিয়ে নবুমামা বেচারার মতো ঘুরে বেড়ায়। রাতের বেলা বড়ো জ্বালাতন করে। কিছুক্ষণ পর পর পানি খেতে চায়। পানি খাবার সঙ্গে

সঙ্গে আবার তার পেছাবের বেগ হয়। পেছাব করানোও কী কম হাঙ্গামা? হ্যাঁরিকেন জ্বালাতে হয়, নবুমামা হাতে নেন একটা টর্চ। আমাকে গিয়ে ডেকে তুলতে হয় নানীজানকে। নানীজান আর আমি বসে থাকি বারান্দায়। নমু মামা টর্চ ফেলে ভয়ে ভয়ে যান। তাতেও রক্ষা নেই, ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠেছেন, ওটা কী, ঐ যে গেল?

কিছু না, শেয়াল।

শেয়াল? তবে ছায়া পড়ল না কেন?

অন্ধকারে ছায়া পড়বে কি রে হাঁদা? নানীজান বিরক্ত হয়ে বলেন।

এই হল নিত্যকার রুটিন।

খাওয়া নিয়েও কী কম হাঙ্গামা! আজি ইচ্ছে হয়েছে কইমাছ ভাজা খাবেন। কইমাছ জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ। সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত পীর-ফকির ধরা হল। ধর্মনগরের সুফি সাহেবের পানিপড়া আনবার জন্যে আমি আর বাদশা মামা নৌকা করে ধর্মনগর রওনা হলাম। দু'দিনের পথ। উজান ঠেলে যেতে হয়। সঙ্গে চাল ডাল নিয়ে নিয়েছি। নৌকাতেই খাওয়া-দাওয়া। বাদশা মামা এই দীর্ঘ সময় চুপচাপ কাটালেন। সন্ধ্যার পর নৌকার ছাদে উঠে বসেন। নেমে আসেন। অনেক রাতে। সারাদিন শুয়ে শুয়ে ঘুমান। দেখলেই বোঝা যায়। ভরসা হারানো মানুষ। কিন্তু কী জন্যে ভরসা হারিয়েছেন তা বুঝতে না পেরে আমার খরাপ লাগে।

সপ্তম দিনে ফিরলাম। সুফি সাহেব খুব খাতির-যত্ন করলেন আমাদের। তাঁর অনুরোধে বাড়িতে চারদিন থেকে যেতে হল। কথা নেই বার্তা নেই, বাদশা মামা সুফি সাহেবের মুরিদ হয়ে গেলেন। মাথায় সব সময় টুপি, নিয়ম করে নামাজ পড়ছেন। যতই দেখি ততই অবাক হই।

আমার অবাক হওয়ার আরো কিছু বাকি ছিল। বাড়িতে ফিরে জানলাম, নবুমামা খুলনা জেলার মনোহরদীপুরে চলে যাচ্ছেন। কিছুদিন সেখানে থাকবেন। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা, শরীর ফিরলে চলে যাবেন রাজশাহী। নানাজানের খালাতো ভাই থাকেন সেখানে। সরকারি জরিপ বিভাগের কানুনগো। নবুমামা সেখানে থেকেই পড়াশুনা করবেন। নানাজান নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িতে তারই আয়োজন চলছে। নবুমামা আগের চেয়েও মিইয়ে গিয়েছেন। আমাকে ধরা গলায় বললেন, লাল ভাবীকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।

আমি ভেবেই পেলাম না একা একা আমি কী কবে থাকব। নবুমামা আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাকে ছাড়া একা একা স্কুলে যাচ্ছি। এই দৃশ্য কল্পনা করলেও চোখে পানি এসে যায়। নবুমামার আমার জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই, তার মুখে শুধুই লাল ভাবীর কথা। আমি বললাম,

নবুমামা, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

আমি কী করে নিয়ে যাব? তুই বাবাকে বল।

নানাজানকে বলবার সাহস আমার নেই। আমি লালমামিকে ধরলাম। মামি তখন বারান্দায় বসে সুচ-সুতো নিয়ে কী যেন করছিলেন। আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে সমস্ত খুলে বললাম।

চুপ করে তিনি সমস্ত শুনলেন। আমার কথা শেষ হতেই বললেন, যা তো, দৌড়ে তোর ছোট খালার কাছ থেকে একটা সোনামুখী সুচ নিয়ে আয়। বলবি আমি চাইছি।

সুচ এনে দিয়ে আমার কাতর অনুরোধ জানালাম।

বলবেন তো মামি? আজই বলতে হবে। আজি সন্ধ্যা বেলাতেই।

মামি বিরক্ত হয়ে বললেন, কি ঘ্যান ঘ্যান করিস, পরের বাড়িতে আছিস যে কুঁশ নেই? ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে বল।

এর কিছুদিন পরই পানশী নৌকা করে নানাজান আর নবুমামা চলে গেলেন। যাবার সময় নবুমামার সে কী কান্না! কিছুতেই যাবে না। লালমামির শাড়ি চেপে ধরেছে। তারস্বরে চৈঁচাচ্ছে, আমি যাব না, যাব না।

লালমামি শুকনো গলায় বললেন, শাড়ি ছাড়, শাড়ি ধরে চৈঁচাচ্ছিস কেন?

৫. নবুমামা চলে যাবার পর

নবুমামা চলে যাবার পর আমার কিছু করবার রইল না। আম-কঁঠালের ছুটি হয়ে গেছে স্কুল। সারাদিন বাড়িতে ঘুরে বেড়াই। বিকেল বেলাটা আর কিছুতেই কাটে না। রোদের তাপ একটু কমতেই হাঁটতে হাটতে চলে যাই সোনাখালী। হেঁটে যেতে যেতে কত আজগুবি চিন্তা মনে আসে। যেন কোন অপরাধ ছাড়াই দেশের রাজা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। হুকুম হয়েছে, আমার ফাঁসি হবে। রাজ্যের সমস্ত লোক ফাঁসির মঞ্চের চারদিকে জড় হয়েছে। আমি তাকিয়ে দেখি, এদের মধ্যে লাল রঙের পোশাক পরা একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, না, এ ছেলে কোনো দোষ করেনি, এর ফাঁসি হবে না। বলতে বলতে মেয়েটি কেঁদে ফেলেছে। আমি বলছি, না, হোক, আমার ফাঁসি হোক। মেয়েটি অপলকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার মুখের গড়ন অনেকটা লালমামির মত।

সোনাখালী পাকাপুলে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতাম। সেই সময় আমার মন থেকে ভূতের ভয় কেটে গিয়েছিল। একেক দিন নিশীথ রাতে একা এক ফিরেছি। অন্ধকারে একা ফিরতে ফিরতে কতবার চমকে উঠেছি নাম-না-জানা পাখির ডাকে। কিন্তু ভয় পাইনি কখনো। রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই মোহরের মা ভাত বেড়ে দেয়, নাও, খেয়ে গুণ্ঠী উদ্ধার কর। এইসব কথা কখনো গায়ে মাখি না।

আমি সে সময় অনেক বড়ো দুঃখে। ডুবে ছিলাম। ছোটখাটো কষ্টের ব্যাপার, যা প্রতিদিন ঘটত, এই নিয়ে সেই কারণেই কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

দিন আর কাটতে চায় না কিছুতেই। স্নেহ, ভালবাসা ছাড়া কোনো মানুষই বাঁচতে পারে না। আমি সেই কারণেই হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাই। কেন জানি না, অসুখটাই ভাল লাগে। সকাল থেকে সন্ধ্যা শুয়ে শুয়ে ঘুমানো ছাড়া অন্য কাজ নেই। মাঝে-মাঝে বাদশামামা এসে বসেন। নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তা হয়। মামা হয়ত বললেন,

বেশি করে দুধ খা, শরীরে জোর হবে।

আচ্ছা মামা, খাব।

পীরপুরে জন্মাষ্টমির মেলা, যাবি নাকি দেখতে?

অসুখ সারলে যাব।

মামা থাকেন অল্পক্ষণ। কথা বলেন ছাড়া-ছাড়া ভঙ্গিতে। দেখে-শুনে বড় অবাক লাগে। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। গাল বসে গিয়ে কেমন প্রৌঢ় মানুষের মত দেখায়।

লালমামি বড়-একটা আসেন না। হয়ত দরজার বাইরে থেকে বললেন,

রঞ্জুর জ্বর আবার এসেছে নাকি?

না মামি, জ্বর নেই।

না থাকলেই ভাল। এই বলে তিনি ব্যস্তভাবে চলে যান। তাঁর যাওয়ার পথে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে থাকি। সে সময়ে লালমামিকে আমি একইসঙ্গে ভালবাসি আর ঘৃণাও করি। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এ ধরনের দ্বৈত অনুভূতি-সে-ই আমার প্রথম। পরবর্তী সময়ে অবশ্যি আরো অনেকের জন্যেই এমন হয়েছে।

ঠিক এ সময়ে আমার সফুরা খালার সঙ্গে অল্পমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা হল। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবে এ আমার খুব ছোটবেলাকার বাসনা। তিনি আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়ো হবেন। খুব চুপচাপ ধরনের মানুষ। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, তিনি একা-একা হেঁটে বেড়াচ্ছেন বারান্দায়। হাতে একটা লাঠি। মাঝে মাঝে ঠক ঠক করে শব্দ করছে আর মুখে বলছেন, উড়ে গেল পাখি। প্রথমদিন এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি! তিনি আমাকে দেখতে পাননি, কাজেই তিনি লাঠি হাতে ঠক ঠক করতে লাগলেন আর পাখি ওড়াতে লাগলেন। আমি যখন গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

খালা, কী করেন?

লজ্জায় খালার চোখে পানি এসে গেল। কোনো রকমে বললেন,

কিছু না, আমি খেলি। তারপরও খালাকে এমন অদ্ভুত খেলা খেলতে দেখেছি। লজ্জা পাবেন এই জন্যে আমি তার সামনে পড়িনি। তাঁর সঙ্গে ভাব করবার আমার খুব ইচ্ছে হত। কিন্তু তিনি আমাকে দেখলেই ভারি লজ্জা পেতেন।

অসুখের সময় প্রায়ই সফুরা খালা এসে দাঁড়াতেন আমার দরজায়। আমি ডাকতাম,

খালা, ভেতরে আসেন।

না, আমি এখানেই থাকি।

এই বলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন দরজায়। অনেক রকম কথা হত তার সাথে। কী ধরনের কথা তা আজ আর মনে নেই, মনে আছে, খালা সারাক্ষণই মুখ টিপে টিপে হাসতেন।

খালা মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব গল্প করতেন।

একদিন এসে বললেন, কাল রাতে ভারি আশ্চর্য একটি ব্যাপার হয়েছে রঞ্জু। ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখি একটি ফুটফুটে পরী আমার খাটে বসে আছে। আমি তো অবাক! তারপর পরীটি অনেক গল্প করল আমার সঙ্গে। ভোর হয়ে আসছে। যখন তখন সে বলল, আমি যাই। আমি বললাম, ও ভাই পরী, তোমার পাখায় একটু হাত দেব? সে বলল, দাও না। আমি পরীর পাখায় হাত বুলিয়ে দেখলাম, কী তুলতুলে পাখা। আর সেই থেকে আমার হাতে মিষ্টি গন্ধ। দেখি না শুঁকে।

আমি সফুরা খালার হাত শুকতেই বকুল ফুলের গন্ধ পেলাম। খালা হয়ত অনেকক্ষণ বকুল ফুলের মালা হাতে করে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারই গন্ধ। সফুরা খালা সত্যি ভারি অদ্ভুত মেয়ে ছিল। এক রাতে ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। আমি লিলিকে স্বপ্নে দেখলাম। সে ঠিক আগেকার মত অভিভাবকসুলভ ভঙ্গি করে বলছে, রঞ্জু, তোর একটুও যত্ন হচ্ছে না। এখানে। তুই আমার কাছে চলে আয়।

আমি লিলির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কত দিন হয়েছে সে চলে গেছে। এ দীর্ঘদিনেও তার কথা কেন যে মনে পড়ল না! স্বপ্ন ভেঙে আমার খুব অবাক লাগল। লিলি যে দেখতে কেমন ছিল তাও পর্যন্ত আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে, তার চিবুকটা লম্বাটে ধরনের ছিল। সেখানে একটা লাল রঙ্গের তিল ছিল। লিলি ছোটবেলায় আমাকে এই তিল দেখিয়ে বলত, রঞ্জু, এই তিলটি যদি কপালে থাকত, তাহলে আমি রাজরানী হতাম।

দীর্ঘদিন পর লিলিকে স্বপ্নে নিখুঁতভাবে দেখলাম। এবং সে রাতেই ঠিক করলাম, ঘুম ভাঙতেই নানাজানের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে লিলিকে চিঠি দেব। এই মনে করে আমার খুব ভাল লাগতে লাগল। মনে হল শরীর সেরে গেছে, একটু বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাই।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই জোছনা দেখে চোখ ছলছলিয়ে উঠল। এমন উথাল-পাথাল আলো দেখলে মানুষের মনে এত দুঃখ আসে। কেন কে জানে?

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। পা যখন ধরে এলো তখন দেয়াল ঘেঁষে বসে রইলাম। হঠাৎ শুনি পাশের ঘরে লালমামি কাঁদছেন।

কোনো ভুল নেই, স্পষ্ট শুনতে পেলাম। মামাও যেন নিচু গলায় কি একটা বললেন। মামি কান্না থামিয়ে ধমকে উঠলেন, কোনো কথা শুনব না। আমি।

বাইরের এই অপূর্ব জোছনার সঙ্গে এই ঘটনা কেমন যেন মিশ খায় না। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

৬. ঠিকানা নিয়ে কী করবি

নানাজান বললেন, ঠিকানা নিয়ে কী করবি?

চিঠি লিখব।

এতদিন পর চিঠি লেখার কথা মনে পড়ল?

আমি চুপ করে রইলাম। নানাজান একটু কেশে বললেন,

শরীরের হাল কেমন? জ্বর আছে?

জি, না।

নবু তোর কাছে চিঠি-ফিঠি লেখে।

জি লেখে।

পূজার বন্ধে বাড়ি আসবে বলে চিঠি লিখেছে আমার কাছে। বলতে বলতে নানাজান হঠাৎ কথা থামিয়ে বলেন,

লিলিরা আগে যেখানে থাকত এখন সেখানে নাই। নতুন ঠিকানা তো আমার জানা নাই।
আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে বলব।

লিলি আপনার কাছে চিঠি লেখে নানাজান?

নানাজান একটু ইতস্তত করে বললেন, কম লেখে।

আশ্বিনের গোড়াতেই নবুমামা এসে পড়লেন।

তাকে দেখে আমার চোখে পলক পড়ে না। লম্বায় বেড়েছেন, স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। ঠোঁটের ওপর হালকা নীল গোঁফের রেখা। নবুমামা আমাকে দেখেই হৈ হৈ করে উঠলেন, তোর এ কি হাল রঞ্জু!

অসুখ করেছিল। আমার। আপনাকে আর চেনা যায় না মামা।

স্বাস্থ্য দেখেছিস? দেখ, হাতের মাসল টিপে দেখ।

মাসল টিপে দেখার দরকার পড়ে না। নবুমামার স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য দেখে ঈর্ষা হয় আমার। লালমামি তো নবুমামাকে চিনতেই পারেন না, কে এসেছে ভেবে খতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওমনি নবুমামা খপ করে তার হাত চেপে ধরলেন। মামি বললেন,

নবু নাকি? তুমি তো বদলে গেছ।

মামি নবুমামাকে আজ প্রথম তুমি করে বললেন। নবুমামা হেসেই কূল পান না। হাসি থামিয়ে কোনমতে বললেন,

ভাবী, তুমি আগের মতই আছ। না, আগের মত নয়, আগের চেয়ে সুন্দর।

অনেক দিন পর নবুমামাকে দেখে কি যে ভাল লাগল! তাছাড়া, মামা এত বেশি বদলে গেছেন। কি করে সেও এক বিস্ময়। ছোটবেলায় দুজনকে তো একই রকম দেখাত। আমি পরম বিস্ময় নিয়ে নবুমামার পিছু পিছু ফিরতে লাগলাম। নবুমামার গল্প আব্বা ফুরোয় না। স্কুলের গল্প, স্কুলের বন্ধুদের গল্প। রাজশাহীর গল্প। এর মধ্যে রাজশাহী থেকে নাটোর রাজবাড়িতে গিয়েছিলেন তার গল্প। আমি শুনি আর অবাক হই।

নবুমামা ক্লান্ত হয়ে এসেছিলেন। দুপুরে খেয়ে-দোয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও বেশ শুয়ে আছি কখন নবুমামা জাগবেন। সেই আশায়। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। ছোট নানিজন এসে ডেকে তুললেন। দুজনে চলে গেলাম। লালমামির ঘরে। মামির প্রতি নবুমামার শৈশবেব যে টান ছিল তা দেখলাম। এতদিনের অদর্শনে এতটুকু কমেনি, ববং বেড়েছে।

লাল মামি বললেন, নবু, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, পরে গল্প কবব তোমাব সাথে। নবুমামা হো হো করে হাসেন।

না, গল্প এখনি করতে হবে। আর আগের মত তুই করে ডাকতে হবে।

এই বলে নবুমামা দাবজায় খিল ঐটে দিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, নবুমামা রহস্যময় ভঙ্গিতে তার প্যান্টের পকেটে হাত দিচ্ছেন,

তোমার জন্যে কি এনেছি, দেখ ভাবী।

বল তো দেখি কি? আন্দাজ কর।

লালমামি ভ্র কুণ্ঠিত করলেন। নবুমামা বললেন,

ছোটবেলায় আমাদের সিগারেট খাইয়েছিলে। আজ আমি সিগারেট নিয়ে এসেছি। আজকে আবার খেতে হবে।

তুমি কি এর মধ্যেই সিগারেট ধরেছ নাকি?

না, ধরিনি। তোমার জন্যে এনেছি।

বলেই নবুমামা নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে লালমামির দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।
লালমামি বললেন,

আমি সিগারেট খাব না।

খেতেই হবে।

নবুমামা জোর করে মামির মুখে সিগারেট গুঁজে দিলেন। থু ধু করে ফেলে দিয়ে মামি
শুকনো গলায় বললেন,

তুমি বড়ো বেয়াড়া হয়ে গেছ নবু।

নবুমামা ভ্রক্ষেপ করলেন না। কায়দা করে সিগারেটের ধোয়া ছাড়তে লাগলেন। এক সময় বললেন,

ভাবী, তোমার কাছে আমি এত চিঠি লিখলাম, জবাব দাওনি কেন?

একটা তো দিয়েছি।

না, এবার থেকে সব চিঠির জবাব দিতে হবে।

এই বলে নবুমামা বেরিয়ে এলেন। বললেন, রঞ্জু, চল মাঠে বেড়াই। খুব বাতাস দিচ্ছে, মাঠে হাঁটলে খিদে হবে।

মাঠে সে রাতে প্রচুর জোছনা হয়েছে। চকচক করছে চারদিক। ঠাণ্ডা একটা বাতাস বইছে। নবুমামা চেষ্টা করে বলল, কি জোছনা! খেতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় কপি কপি করে খেয়ে ফেলি। নবুমামা মুখ হা করে খাবার ভঙ্গি করতে লাগল। বিস্মিত হয়ে আমি তার আনন্দ দেখলাম।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখি বাদশা মামা জলচৌকিতে চুপচাপ বসে আছেন। নবুমামাকে দেখে নিজীব কণ্ঠে শুধালেন,

কখন এসেছিস?

সকালে। তুমি কোথায় ছিলে?

বাদশা মামা বিড়বিড় করে কি বললেন, বোঝা গেল না। নবুমামা বললেন, তোমার কি হয়েছে?

বাদশা মামা এর উত্তরেও বিড়বিড় করলেন।

ভাত খেতে খেতে নবুমামা বললেন, বাদশা ভাইয়ের কি হয়েছে?

নানীজান বললেন, জাদু করেছে তাকে।

কে জাদু করেছে?

কে আবার; বউ।

নবুমামা রেগে গিয়ে বলল, কি সব সময় বাজে কথা বলেন।

নানীজান বললেন, কি যে গুণের বউ, তা কি আর এতদিনে জানতে বাকি আছে আমার? বাদশার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না।

লালমামি কখন যে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন জানতে পারিনি। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কে যাদু করেছে, মা?

নানীজান বললেন, বউ, তুমি চোখ রাঙিয়ে কথা বল কার সঙ্গে?

আমি চোখ রাঙিয়েছি?

তুমি কার ওপর গরম দেখাও বউ, রূপের দেমাগে তো পা মাটিতে পড়ে না। এদিকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারি না আমি। বাঁজা মেয়েমানুষ বলে সারা দুনিয়ার লোকে তোমাকে ডাকে।

নবুমামা বললেন, মা, আপনি চুপ করেন।

কোন চুপ করব? কাকে ডরাই আমি? বাদশাকে আজ বললে কাল সে তিন তালাক দেয়।

লালমামি বললেন, তাই বলেন না কেন? ঐ তো বসে আছে চৌকিতে। যান, গিয়ে বলেন।

নবুমামা আর আমি দোতলায় উঠে দেখি মামি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। আমাদের দেখে উঁচু গলায় বললেন,

নবু, তুমি কালকে আমাকে বাবার বাড়িতে রেখে আসবে?

নবুমামা চুপ করে রইলেন।

নবুমামা এক মাস রইলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি অনেক গল্পের বই নিয়ে এসেছিলেন, প্রতিদিন সেগুলি পড়া হত। লোহারামের কেচ্ছা বলে একটি বই ছিল। এমন হাসির! নবুমামা পড়তেন, আমি আর লালমামি শুনে হেসে গড়াগড়ি। ছোট নানীজান এক একদিন রেগে ভূত হতেন।

আস্তে হাসতে পার না বউ? তোমার শ্বশুর শুনলে কি হবে?

মোহরের মা আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলত—

যত হাসি তত কান্না
কহে গেল রাম সন্না।

নবুমামা শুনতে পেলে বলতেন, মোহরের মা, তোমার রাম সন্না কে এই বইটা একটু পড়তে দিও। দেখি ব্যাটা হাসে কি কাঁদে।

একদিন হাসির শব্দ শুনে লাজুক পায়ে সফুরা খালা এসে হাজির। দরজার ওপাশ থেকে ফিকফিক করে বলছে,

ভাবী, তোমরা কি নিয়ে হাসছ?

গল্প শুনে হাসছি। হাসির গল্প।

সফুরা খালা ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে মিটমিট হাসি হাসতে লাগলেন। যেন আমাদের কোনো গোপন অভিসন্ধি টের পেয়ে গিয়েছেন। তারপর আগের মত ফিকফিক গলায় বললেন,

হাসির গল্প আমার ভাল লাগে না।

তবু তিনি অনৈক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে নবুমামার গল্প পড়া শুনলেন। তারপর বললেন, চল না, সবাই মিলে দীঘির ঘাট থেকে বেড়িয়ে আসি। এখন তো আর লোকজন নেই।

সেদিন থেকে আমাদের রুটিন হল, গল্প-টল্প পড়ার পর দীঘির ঘাটে বেড়াতে যাওয়া। বেড়াতে বেড়াতে একদিন নবুমামার উল্লাসের কোনো সীমা থাকত না। স্কুল থেকে শিখে আসা একটা হিন্দি গান বেসুরো গলায় ধরে বসতেন। প্রথম লাইনটি বোধ হয় এরকম ছিল

“মাটি মে পৌরণ

মাটি মে শ্রাবণ

মাটি মে তেন বন যায়গা।”

পাখির ডানায় ভর করে সময় কাটতে লাগল। অবশিষ্ট বেড়াতে এসে মাঝে মধ্যে লালমামির ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। সেগুলি ঘটত তখন যখন মামি দেখতে পেতেন বাদশা মামা ঘাটের উল্টোদিকে চুপচাপ বসে আছেন। দেখে মনে হয়, যেন মানুষ নয়, উইয়ের টিবি। এতটুকু নড়াচড়াও নেই।

দেখতে দেখতে নবুমামার ছুটির দিন ফুরিয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগল, একা একা আমার থাকতে হলে আমি আর বাঁচিব না। যতই যাওয়ার দিন এগিয়ে আসে ততই আমার কষ্ট বাড়তে থাকে। যাবার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ভারি মন নিয়ে লালমামির ঘরে বসে আছি। নবুমামাও কথা বলছেন না। এমন সময় নিচে থেকে কানাবিবি ডাকল, ও এলাচি বেগম! ও এলাচি বেগম!

লালমামি বললেন, আসছি, কেন ডাকে দেখে না।

নবু মামা বললেন-তোমার নাম এলাচি কেমন ভারী?

আমার মুখে সব সময়-এলাচির গন্ধ থাকে, এই জন্যেই এলাচি নাম।

নবু মামা এগিয়ে এসেছেন, আগে তো কোনোদিন বলনি-শুঁকে দেখতাম! দেখি ভারী, মাথাটা একটু নিচু করত।

কি পাগলামি কর নবু।

বলার আগেই নবু মামা লালমামির মাথা ঝাপটে ধরেছে এবং হৈ হৈ করে উঠেছে। আরে সত্যি তাই। এলাচির গন্ধ।

ছোট নানীজান ঢুকলেন এ সময়, শুকনো গলায় বললেন, ও বউ, তোমাকে এক ঘণ্টা ধরে ডাকছে কানাবিবি। কানে শুনতে-টুনতে পাও তো?

লালমামি বললেন, কি জন্যে ডাকছে?

সে যে তোমাকে গলায় আর কোমরে বাঁধবার জন্যে তাবিজ দিয়েছিল, সেগুলি কি করেছে?

ফেলে দিয়েছি।

কোন ফেলে দিয়েছ?

তাবিজ দিলে কি হবে?

নানীজান রেগে আগুন হয়ে বললেন, কি, অত বড়ো সাহস তোমার বউ? আল্লার কোরআন কালামকে অবিশ্বাস। রোজা নাই, নামায নাই! বেহায়া বেপর্দা মেয়ে!

নবুমামা বললেন, মা, আপনি চুপ করেন।

না, চুপ করব কেন? বউ শেষ কথা আমার, তাবিজ দিবা কি-না কও।

লালমামি বললেন, আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন। সে যদি বলে তাবিজ দিলেই আমার ছেলেমেয়ে হবে, তাহলে দিব।

এমন সময় নিচে হৈচৈ শূনা গেল। আমি আর নবুমামা দৌড়ে গিয়ে দেখি, রহমত মিয়া শিকল খুলে কিভাবে যেন বেরিয়ে পড়েছে। হাতে শিকল নাচাচ্ছে, আর বলছে কাঁচা খাইয়া ফেলামু! কাঁচা খাইয়া ফেলামু!

লোকজন ঘিরে ফেলেছে তাকে। কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। দু'একজন লম্বা বাঁশ বাগিয়ে ধরে আছে। নানাজান বললেন,

কেউ ওরে মারবে না, খবরদার। সাবধানে ধর।

বহু কসরত করতে হল ধরতে গিয়ে। শিকলের বাড়ি খেয়ে হারিস সর্দার তো প্রায় মরোমরো। নানাজান বললেন, যাও, নৌকায় করে পাগল হারামজাদাটাকে এক্ষুণি নন্দিপুরের বাজারে ছেড়ে দিয়ে আসো! এঁটো কাঁটা খেয়ে বেশ বেঁচে থাকবে।

ঘাটে নৌকা তৈরি ছিল। বহু উৎসাহী সহযাত্রী তৈরি হয়ে পড়ল। একটি জলজ্যান্ত পাগলকে অন্যত্রামের বাজারে ছেড়ে আসা এ্যাডভেঞ্চারের মত।

পাগল তো কিছুতেই নৌকায় উঠবে না। চোঁচামেচি চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলেছে। কিন্তু নৌকায় উঠেই তার ভাবান্তর হল। হাত ডুবিয়ে দিল নদীর পানিতে, তারপর খুশিতে হেসে ফেলল।

আহা! পাগলটার কারবার দেখে বড়ো মায়া লাগে রে।

তাকিয়ে দেখি, ঘাটের উপর বসে থেকে বাদশা মামা আফসোস করছেন। তার চোখ স্নেহ ও মমতায় চক চক করছে।

পরবর্তী দু'দিন বাড়ির আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত রইল। নবু মামা যে সকালে চলে যাবেন সে সকালে লালমামির সঙ্গে কানাবিবির একটা ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়ে গেল। ঘুম ভেঙেই শুনি লালমামী বলেছেন—

এ কানাবিবির কাজ। কানাবিবি, তোমার এমন সাহস।

কানাবিবি বলছে—

বাড়ির বউ মানুষ কেমন গলায় কথা কয় গো।

বিষয় আর কিছু নয়। লালমামি ঘুমোতে গিয়ে দেখেছেন, তার বালিশের নিচে শাড়ির পাড়ের টুকরো, মাথার চুল, একখণ্ড ছোট হাড়-এই জাতীয় জিনিস সুতো দিয়ে বেঁধে রেখে দেয়া। বশীকরণের জিনিসপত্র হয়ত। সেই থেকেই এ বিপত্তি।

নবুমামাকে স্টেশনে দিয়ে আসতে আমি সঙ্গে চলেছি। রাত দুটোয় ট্রেন। সন্ধ্যাবেলা খেয়েদেয়ে রওনা হয়েছি। হ্যারিকেন দুলিয়ে একটি কামলা যাচ্ছে আগে আগে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হুহু করে। নবুমামা আর আমি গল্প করতে করতে যাচ্ছি। হঠাৎ মামা বললেন,

ও তোকে বলা হয়নি, লিলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। শান্তাহার স্টেশনে। প্লাটফর্মেরে বসেছিল, আমি তাকে চিনতে পারিনি। হঠাৎ ডাকল,

নবুমামা, না?

নবুমামা কিছুক্ষণ থেকে বললেন, খুব গরিব হয়ে গেছে। রোগা হয়েছে খুব। ময়লা কাপড়চোপড়। এমন খারাপ লাগল দেখে।

লিলির বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি?

না, লিলি বলল, আমাকে দেখে লজ্জা পেয়ে নাকি লুকিয়ে আছে কোথায়।

আর কিছু বলেনি?

তোর কথা জিজ্ঞেস করল। তার অবস্থা একটু ভালো হলেই তোকে নাকি তার কাছে নিয়ে যাব।

নবুমামা বললেন, তোর মন খারাপ হয়েছে?

হ্যাঁ।

আমারো হয়েছে। বিয়ের পর যখন লিলি শ্বশুরবাড়ি গেল, মনে আছে, রঞ্জু?

আছে।

ট্রেনে উঠে কি কাঁদাটাই-না কাঁদল।

নবুমামা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

৭. খুব অর্থকষ্টে পড়লাম

সেবার আমি খুব অর্থকষ্টে পড়লাম।

স্কুলের বেতন দিতে হয়। মাঝে-মধ্যে চাঁদা দিতে হয়। আগে নবুমামা যখন দিতেন সে সঙ্গে আমারটাও দিয়ে দিতেন। এখন আমি একলা পড়েছি। নিজ থেকে কারো কাছে কিছু চাইতে পারি না। পোশাকের বেলায়ও তাই। নবুমামার কাপড়-জামা বরাবর পরে এসেছি। লিলিও প্রায়ই বানিয়ে দিয়েছে। অসুবিধে হয়নি কিছু। এখন অসুবিধে হতে লাগল। কি করব ভেবে পাই না। বাদশা মামার কাছে কিছু চাইতে লজ্জা করে। আমি খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবা খুব কষ্ট ও লজ্জার ব্যাপার। আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। খুব ইচ্ছে হতে লাগল লিলির কাছে চলে যাই। কিন্তু তার কাছে চিঠি লিখে জবাব পাই না। পুরোনো জায়গা ছেড়ে তারা নতুন যেখানে গিয়েছে, তার ঠিকানাও জানায়নি কাউকে।

তাছাড়া নানাজানের সংসারেও নানারকম অশান্তি শুরু হয়েছে। তাঁর জন্মশত্রি হালিম শেখ জমি নিয়ে মামলা শুরু করেছে। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মত। বৃদ্ধ বয়সে নানাজানকে কোর্ট-কাঁচারিতে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। বাদশা মামাকে দিয়ে তো কোন কাজ করাবার উপায় নেই। তিনি জড় পদার্থের মত হয়ে গিয়েছেন। সুফি সাহেবের বাড়ি থেকে ফিরবার পর বেশ কিছুদিন ধর্ম-কর্ম নিয়ে ছিলেন। লোকে ভালই বলেছে। এখন সেসব ছেড়েছেন। নেশা-ভাঙও নাকি করেন আজকাল।

সফুরা খালাকে নিয়েও অনেক রকম অশান্তি হচ্ছে। তখন তিনি দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠেছিলেন। তার বিয়ের কথাবার্তাও হচ্ছে। একবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ছেলের বাবা মেয়ে দেখে মহাখুশি। এমন ভাল স্বভাবের মেয়ে সে নাকি তার সমস্ত জীবনে দেখেনি। কিন্তু বিয়ে হল না। সফুরা খালাকে নিয়ে নানারকম রটনা। তার না-কি মাথা খারাপ। রাতে-বিরেতে মেয়ে না-কি পুকুরঘাটে হেঁটে বেড়ায়। একবার কোনো মেয়ে সম্পর্কে এ জাতীয় কথা ছড়িয়ে পড়াটা খুব খারাপ লক্ষণ। এ নিয়ে ঘরেও অশান্তির শেষ নেই। নানিজন বিনিয়ে-বিনিয়ে গানের মত সুরে কাঁদেন। মাঝে মাঝে আপন মনে বলেন, আমার নসীব, বিয়ে করলাম ছেলে, বউটা বাঁজা-মেয়েটাও আধা-পাগলা।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত অশান্তি সেই সফুরা খালা নির্বিকার। আমি একদিন সফুরা খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, খালা, আপনি নাকি রাতে-বিরেতে একা একা ঘুরে বেড়ান?

খালা মৃদু গলায় বললেন, এক একা পুকুর ঘাটে বসে থাকতে এত ভাল লাগে!

তাকে নিয়ে চারিদিকে যে এত অশান্তি সেদিকে কিছুমাত্র খেয়াল নেই। আছে আপন মনে। তার জন্যে আমার খুব কষ্ট হতে শুরু করল। খালাকে আমি তখন ভালবেসে ফেলেছি।

আসলে খালাকে আমি একটুও বুঝে উঠতে পারিনি। যাবতীয় দুর্বোধ্য বস্তুর জন্যে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। সেই জন্যেই তার প্রতি আমার প্রবল ভালবাসা গড়ে উঠল। আমার ইচ্ছে হল, তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব গড়ে উঠুক।

কিন্তু তিনি নিজের চারদিকে একটি দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন। এই দেয়াল ভেদ করে তার নৈকট্য লাভের উপায় নেই। নিজের সৃষ্টি জগতেই তিনি ডুবে আছেন। বাইরের প্রতি একটুও খেয়াল নেই। ইচ্ছে হল তো চলে গেলেন পুকুর পাড়ে। একা বেড়াতে গেলেন বাগানে।

এসব দেখে-শুনে কেন জানি না। আমার একটা ধারণা হয়েছিল, সফুরা খালা বড় রকমের দুঃখ পাবে জীবনে। এ রকম মনে করবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আমার মনে হত, একেই হয়ত intuition বলে।

পরবর্তী জীবনে দেখেছি। আমার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। দুঃখ এসেছে এবং অত্যন্ত সহজভাবে জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মত দুঃখকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এই মেয়ের গল্প আমি অন্য কোথাও বলব। আজ শুধু হাসান আলীর কথাটাই বলি।

হাসান আলী বাজারে কিসের যে ঠিকাদারী করত। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স। ভীষণ গরিব। নানাজানের কি রকম যেন আত্মীয়। থাকত নানাজানের বাংলাঘরে (বাড়ির বহির্মহলে অতিথি অভাগতদের জন্যে নির্মিত ঘরকেই বাংলাঘর বলা হত)।

অত্যন্ত নিরীহ ধরনের ছেলে। যতক্ষণ ঘরে থাকত। ততক্ষণ বসে বসে হিসেবপত্র করত। আমরা সে সময় তার ঘরে হাজির হলে বিনা কারণে আঁৎকে উঠত। তারপরই সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে চোখ লাল করে এক বিশি কাণ্ড। প্রতি হাটবার দিন দেখতাম সে অল্প কিছু মিষ্টি কিনে এনেছে। মিষ্টি আনা হয়েছে নানাজানের বাড়ির মানুষদের জন্যেই কিন্তু দেওয়ার সাহস নেই। অনেক রাতে কাউকে ডেকে হয়ত ফিসফিস করে বলল, একটু মিষ্টি এনেছিলাম। বাড়ির প্রায় মানুষই তখন ঘুমে।

সফুরা খালা একদিন বললেন, ও রঞ্জু, হাসান আলী বলে একটা লোক নাকি থাকে বাইরের ঘরে। আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে?

ও আল্লা, মজার ব্যাপার হয়েছে। পরশুদিন দিঘির পাড়ে একা একা গিয়েছি, দেখি কে একজন লোক চুপচাপ বসে আছে। আমি বললাম, কে ওখানে। লোকটা বলল, আমার নাম হাসান আলী, আমি আপনাদের বাংলা ঘরে থাকি। আমি তখন ভাবলাম, ফিরে যাই। লোকটা বলল, এত রাতে আপনি একা একা আসেন কেন? কত সাপ-খোপ আছে। আমি বললাম, আপনি তো আসছেন, আপনার সাপের ভয় নাই?

লোকটা তখন কি বললেন জান রঞ্জু?

না।

বলল, আপনি বড় ভাল মেয়ে এই বলেই হন হন করে চলে গেল। কি কাণ্ড দেখেছ?

এর কিছুদিন পরই শুনলাম হাসান আলী নানাজানের কাছে তার ছোট মেয়েটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব করছে। নানাজান তো রেগেই আগুন। বাড়িতে হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল। সফুরা খালা শুধু বলেন, আহা, বেচারী গরিব বলে কি সবাই এ রকম করবে। ছিঃ! লালমামি ওকথা শুনে বললেন, আমাদের সফুরার ভাতারকে নিয়ে কেউ তামাশা করবে না, খবরদার। সফুরা মনে কষ্ট পায়। নানাজান লালমামির কথা শুনে রেগে যান। চোঁচিয়ে বলেন, এ কি কথা বলার ঢং বউ!

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। নানাজান হাসান আলীকে এখানকার বাস উঠিয়ে চলে যেতে বললেন। শরৎকালের এক সকালে নৌকা করে হাসান আলী চলে গেল। দুটি ট্রাকের উপর বিবর্ণ সতরঞ্জিতে ঢাকা একটি বিছানা, তার পাশে মুখ নিচু করে বসা হাসান আলী।

সফুরা খালা এর পর থেকেই অস্থির হয়ে পড়লেন। মুখে শুধু এক বুলি, বিনা দোষে কষ্ট পেল লোকটা! নবুমামা অনেক পরে এ ঘটনা শুনে বলেছিলেন, আমি থাকলে দিতাম শালার ঘাড়ে গদাম করে এক ঘুসি। সফুরা খালা বিষণ্ণ কণ্ঠে বলছেন, ছিঃ নবু, ছিঃ!

৮. অচিনপুরের গল্প

অচিনপুরের গল্প লিখতে গভীর বিষাদে মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। অনুভব করছি, সুখ এবং দুঃখ আসলে একই জিনিস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুখ বদলে গিয়ে দুঃখ হয়ে যায়। দুঃখ হয় সুখ। জীবনের প্রবল দুঃখ ও বেদনার ঘটনাগুলি মনে পড়লে আজ আমার ভাল লাগে। প্রাচীন সুখের স্মৃতিতে বুক বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়।

হাসনার কোলে তিন মাস বয়সের যে শিশুটি এ সংসারে প্রবেশ করেছিল তার ভূমিকা তো যুক্তিসঙ্গত কারণেই তৃতীয় পুরুষের ভূমিকা হবে। তার উপস্থিতি হবে ছায়ার মত। সরফরাজ খানের এই পরিবারটির সুখ-দুঃখ তাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু আমি তাদের জীবনের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবেই না জড়িয়ে পড়লাম। বাদশা মামার মলিন চেহারা দেখলে আমার মন কাঁদে। সফুরা খালা যখন হেসে হেসে বলেন,

রঞ্জু, আমার খুব ইচ্ছে একদিন অনেক রাতে পুকুরে একা একা সাতার কেটে গোসল করি। পুকুর-ঘাটে তুমি আমার জন্যে একটুখানি দাঁড়াবে রঞ্জু? কেউ যেন জানতে না পারে।

তখন সফুরা খালার জন্যে আমার গাঢ় মমতা বোধ হয়। অথচ আমি নিশ্চিত জানি একদিন লিলির চিঠি আসবে। আমি এদের সবাইকে পেছনে ফেলে চলে যাব।

হালিম শেখের সঙ্গে পর পর দুটি মামলাতে নানাজানের হার হল। এতদিন যে জমিতে নানাজানের দখলিস্বত্ব ছিল, হালিম শেখের লোকজন লাল নিশান উঠিয়ে ঢোল আর কাসার

ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সে জমির দখল নিল। গ্রামের লোকজনকে গরু জবাই করে খাওয়াল হালিম শেখ।

জমির পরিমাণ তেমন কিছু নয়। অর্থব্যয়ও হয়েছে সামান্য। নানাজানের মত লোকের কাছে সে টাকা কিছুই নয়। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়লেন। রোজকার মত উঠোনে বসে কোরান পাঠ করতে বসেন না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের ভেতর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। খাওয়া কমে গেল। রাতে ঘুমুতে পারেন না। উঠোনে অনেক রাত পর্যন্ত চেয়ার পেতে বসে থাকেন। নানীজান মাথায় হাওয়া করেন। পায়ে তেল মালিশ করে দেন।

দিন সাতেক পর নানাজান ঘোষণা করলেন, তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করতে চান। নবুমামার কাছে চিঠি গেল তিনি যেন পত্রপাঠ চলে আসেন, পড়াশুনার আর প্রয়োজন নাই। লোক পাঠিয়ে দামি কাফনের কাপড় কেনালেন। কবরের জন্য জায়গা ঠিক করা হল। কবর পাকা করবার জন্য ইট আনানো হল। মৌলানা ডাকিয়ে তওবা করলেন। বাড়ির সবাই এই নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রস্তুতি দেখতে লাগল। ঠিক এই সময় বুড়ো নানীজান মারা গেলেন।

মোহরের মা রোজ সকালে দুধ নিয়ে যায় নানীজানের ঘরে। সেদিন কি কারণে যে দেরি হয়েছে। দুপুরের দিকে বাটিভর্তি দুধ নিয়ে গিয়েছেন। ঘরে ঢুকেই বিকট চিৎকার। মৃত্যু এসেছে নিঃশব্দে। কেউ জানতেও পারেনি কখন কিভাবে মারা গেলেন।

আমরা সবাই তার ঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়ালাম। পরিপাটি বিছানা পাতা। বালিশের চাদর পর্যন্ত একটুও কুচকায়নি। বুড়ো নানীজান সেই পরিপাটি বিছানায় শক্ত হয়ে পড়ে

আছেন। ইদুর কিংবা অন্য কোন কিছু তার ঠোঁট আর একটি চোখ খেয়ে গিয়েছে। বিকট হা করা সেই মৃত্যু দেখে সুফুরা খালা ও মাগো, ও মাগো বলে কাঁদতে লাগলেন। লালমামি সুফুরা খালার হাত ধরে তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

নানাজানের জন্য কেনা। কাফনের কাপড়ে তার কাফন হল। নানাজানের জন্যে ঠিক করে রাখা জায়গায় কবর হল তার। যে ইট নানাজান নিজের জন্যে আনিয়েছিলেন, সেই ইট দিয়ে কবর বাধিয়ে দেওয়া হল।

সপ্তাহ খানিকের মধ্যে আমরা সবাই বড় নানীজনের কথা ভুলে গেলাম। আগের মত ঝগড়া, রঙ-তামাশা চলতে লাগল। বড় নানীজনের ঘর থেকে তার সমস্ত জিনিস সরিয়ে ফেলে সংসারের প্রয়োজনীয় পৈঁয়াজ রসুন রাখা হল গাদা করে।

দিন কেটে যেতে লাগল। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন। সেই একা একা হাঁটতে হাঁটতে সোনাখালী চলে যাওয়া। পুকুরঘাটে রাতের বেলা চুপচাপ বসে থাকা। এর বাইরে যেন আমার জন্যে কোনো জগৎ নেই। সমস্ত বাসনা-কামনা এইটুকুতেই কেন্দ্রীভূত। এর মধ্যে একদিন নানাজান আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেছেন। বলেছেন,

তোমার বড় নানীজান তার নিজের সম্পত্তি তোমাকে আর লিলিকে দিয়ে গিয়েছেন দানপত্র করে।

বড় নানীজান তার বাবার কাছ থেকে প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছিলেন জানতাম, তার পরিমাণ যে কত তা কেউ জানত না। নানাজান বললেন, অনেক জায়গা-জমি, লিলির আসা দরকার। কিন্তু তার ঠিকানা তো জানা নেই।

৯. রাজশাহী থেকে খবর এল

রাজশাহী থেকে খবর এল, স্কুল ফাইন্যাল দিয়েই নবুমামা কাউকে কিছু না বলে কলকাতা চলে গেছেন। নানাজানের মুখ গম্ভীর হল। নানীজনের কেন জানি ধারণা, নবুমামা আর কখনো ফিরবে না। তিনি গানের মত সুরে যখন কাঁদতে থাকেন তখন বলেন, এক মেয়ে পাগল, এক ছেলে বিরাগী, এক বউ বাঁজা।

শুনলে হাসি পায়, আবার দুঃখও লাগে। বাদশা মামা মাঝে-মাঝে গিয়ে নানীজনকে ধমক দেন, কি মা, আপনি সব সময় বাঁজা বউ বাঁজা বউ করেন!

নানীজন ক্ষেপে গিয়ে বলেন,

ও বাঁজা বউকে আমি আর কি বলে ডাকব?

আহা, এলাচি মনে কষ্ট পায়।

নানীজনে কপালে করাঘাত করেন। আর বলেন,

হা রে বউ, তুই কি জাদুটাই না করলি!

বাদশা মামা চিন্তিত, বিরক্ত আর ক্লান্তমুখে চলে আসেন।

নবুমামা হঠাৎ করে কলকাতা চলে যাওয়ায় খুশি মনে হয় শুধু সফুরা খালাকে। আমাকে ডেকে বলেন, আমি ছেলে হলে নবুর মত কাউকে না বলে আমিও চলে যেতাম।

আট-দশ দিন পর নবুমামা কলকাতা থেকে টাকা চেয়ে পাঠাল। নানাজান লোক মারফত টাকা পাঠালেন। নির্দেশ রইল, ঘাড় ধরে যেন তাকে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, নবুমামাকে বিয়ে দেওয়া হবে। নানাজান মেয়ে দেখতে লাগলেন। নানীজান মহাখুশি। লালমামিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, নতুন বউয়ের এক বৎসরের ভিতর ছেলে হবে-আমি স্বপ্ন দেখেছি।

টাকা নিয়ে লোক যাওয়ার কয়েকদিন পরেই নবুমামা এসে পড়লেন। সরাসরি এসে বাড়িতে তিনি উঠলেন না, লোক মারফত খবর পাঠালেন কাউকে কিছু না বলে আমি যেন আজিজ খাঁর বাড়িত চলে আসি।

আজিজ খাঁর বাইরের ঘরের চেয়ারে নবুমামা গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। মাথায় বেড়েছেন কিছু। গায়ের রঙ ফর্সা হয়েছে। আমাকে দেখে রহস্যময় হাঁসি হাসলেন, বাড়িতে কেউ জানে না তো আমি এসেছি যে?

না।

গুড।

কি ব্যাপার নবুমামা?

একটা প্ল্যান করেছি। রঞ্জু। লালমামিকে একবার চমকে দেব। গ্রামোফোন কিনেছি একটা। ঐ দেখ টেবিলে।

আমি হা করে টেবিলে রেখে দেয়া বিচিত্র যন্ত্রটি তাকিয়ে দেখি। নবুমামা হাসি মুখে বলেন, পাঁচটা রেকর্ড আছে। একশ পনের টাকা দাম।

নবুমামার প্ল্যান শুনে আমার উৎসাহের সীমা থাকে না। রাতের বেলায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নবুমামা গ্রামোফোন নিয়ে চুপি চুপি যাবেন। যে ঘরটায় আমি আর নবুমামা থাকি সেই ঘরটায় চুপ চুপি এসে গ্রামোফোন বাজানোর ব্যবস্থা করা হবে। গান শুনে হকচাকিয়ে বেরিয়ে আসবেন লালমামি। অবাক হয়ে বলবেন,

রঞ্জ কি হয়েছে রে, গান হয় কোথায়?

তখন হো হো করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবেন নবুমামা। উৎসাহে নবুমামা টগবগ করছেন। আমি বললাম,

নবু মামা, এখন একটা গান শুনি।

নবুমামা হা হা করে ওঠেন, না না, এখন না। পরে শুনবি। ফাস্টে কোনটা বাজাব বল ত?

কি করে বলব, কোনটা?

সেদিন সন্ধ্যার আগে-ভাগেই ঝুমঝুম করে বৃষ্টি নামল। সে কি বৃষ্টি! ঘরদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। নবুমামা বিরক্ত মুখে বসে। রইলেন। রাতের খাওয়া-দাওয়া আজিজ খাঁর ওখানেই হল।

রাত যখন অনেক হয়েছে, লোকজন শুয়ে পড়েছে, সবখানে, তখন আমরা উঠলাম। বৃষ্টি থামেনি, গুড়ি গুড়ি পড়ছেই। মাথায় ছাতা ধরে আধভেজা হয়ে বাড়িতে উঠলাম। কাদায়-পানিতে মাখামাখি। বাড়িতে জেগে কেউ নেই। শুধু নানাজানের ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। দুজনে নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলাম। দরজা খোলা হল অত্যন্ত সাবধানে। একটু ক্যাচ শব্দ হতেই দুজনে চমকে উঠছি।

অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে বের করলেন নবুমামা। বহু কষ্ট করে চোঙ্গ ফিট করা হল। দম দিতে গিয়ে বিপত্তি, ঘাস ঘাস শব্দ হয়। তবে ভরসার কথা, ঝামঝামিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। নবুমামা ফিসফিসিয়ে বললেন, কোন গানটা দিয়েছি কে জানে। একটা খুব বাজে গান আছে। এটা প্রথমে এসে গেলে খারাপ হবে খুব।

আমি বললাম, নবুমামা, দেরি করছি কেন?

দিচ্ছি। বৃষ্টিটা একটু কমুক, নয়ত শুনবে না।

বৃষ্টির বেগ একটু কমে আসতেই গান বেজে উঠল,

আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো

তোরে আমি কোথায় রাখি বল।

লালমামি গান শুনে মুগ্ধ হবে কি, আমি নিজেই মোহিত হয়ে গেলাম। কি অপূর্ব কিন্নর কণ্ঠে গান হচ্ছে। বাইরে ঝামঝামিয়ে বৃষ্টি। আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠল।

নবুমামা ফিসফিসিয়ে বললেন, কি ব্যাপার, ভাবী আসে না যে? ও রঞ্জু।

আমি সে কথায় জবাব দিলাম না। বাইরে তখন ঝড় উঠেছে। জানালার কপাটে শব্দ খট খট। নবুমামা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি লালমামি ডাকলেন,

রঞ্জু, রঞ্জু!

নবুমামা ফিসফিস করে বললেন, চুপ করে থাক, কথা বলবি না। আমি চুপ করে রইলাম। নবুমামা অন্য রেকর্ড চালিয়ে দিল—

‘যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন’

লালমামি দরজায় ঘা দিলেন, ও রঞ্জু, কি ব্যাপার, গান হয় কোথায়? নবুমামা উত্তেজনায় চেপে রাখতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন, ভাবী তোমার জন্যে আনলাম। তোমার জন্যে আনলাম। নবুমামা লালমামির হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল। কি ফুটি তার! লালমামি বললেন, কলের গান না? ছোটবেলায় দেখেছিলাম একবার। চোঙ আছে? বাতি জ্বালাও না।

বাতি জ্বালানো হল। লালমামিকে দেখব কি? নবুমামার দিকেই তাকিয়ে আছি। আনন্দে উত্তেজনায় নবুমামার চোখ জ্বল জ্বল করছে। মামি বললেন, ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো গানটা আরেকবার দাও।

সেই অপূর্ব গান আবার বেজে উঠল। বাইরে তখন ঝড়-বৃষ্টি।

সে রাতের কথা আমার খুব মনে আছে।

একটি মানুষের সামগ্রিক জীবনে মনে রাখবার মত ঘটনা তো খুব সীমিত। কত মানুষ আছে, সমস্ত জীবন কেটে যায় কোনো ঘটনাই মনে রাখার মত আবেগ তার ভেতরে সৃষ্টি করে না। আমি নিজে কত কিছুই তো ভুলে বসে আছি। কিন্তু মনে আছে, সে রাতে গান শুনতে নিজের অজান্তেই আমার চোখে পানি এসেছিল। নবুমামা আর লালমামি যেন দেখতে না পায় সে জন্যে মাথা ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। নবুমামা বললেন,

ভাবী, আমার নাচতে মন চাইছে।

নাচ না।

নবুমামা বললেন,

রঞ্জু, তুই নাচবি আমার সঙ্গে?

আমি সে কথার জবাব দিলাম না। মামি বললেন,

নবু, ঐ রেকর্ডটা আবার।

সারারাত হবে আজকে। বুঝলে ভাবী।

ক্লান্তি নেই নবুমামার । লালমামির উৎসাহও সীমাহীন । শুনতে শুনতে আমার ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল । নবুমামা বললেন, গাধা! এত ফাইন গান আর ঘুমায় কেমন দেখ ।

লালমামি বললেন,

আজ তাহলে থাক । ঘুমো তোরা ।

না না, থাকবে না । যতক্ষণ ঝড়-বৃষ্টি হবে ততক্ষণই গান হবে । কথা শেষ হতে-না হতেই কড় কড় করে বাজ পড়ল ।

ফুর্তিতে নবুমামা হো হো করে হেসে ফেললেন । মামি বললেন, রঞ্জু, ঘুম পাচ্ছে । এগুলি নিয়ে আমার ঘরে এসে পড়, নবু আমাকে ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো গানটা শুনে শুনে লিখে দিতে পারবি কাগজে?

নিশ্চয়ই পারব । নিশ্চয়ই ।

জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছিল, উঠে বন্ধ করতে গিয়ে দেখি বড় নানীজনের ঘরের লাগোয়া গাব গাছটি ভেঙে পড়ে গেছে । কেমন নেড়া দেখাচ্ছে জায়গাটা । ভালই ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে । বাতাস খেমে গেলেও বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে । কে জানে গতবারের মত এবারেও হয়ত বান ডাকবে । গতবার এ রকম সময়ে বাড়ি থেকে নদীর শো শো শব্দ শোনা গেছে । চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনি, নবুমামা বলছেন, ভাবী, তুমিও গাও । সঙ্গে, সঙ্গে—

না না, আমি পারব না । তুই গা, মাটি সে পৌরনটা গা ।

নবুমামা হেঁড়ে গলায় গান ধরলেন—

মাটি মে পৌরন, মাটি মে শ্রাবণ
মাটি মে তনবিন যায়গা
যব মাটি সে সব মিল জায়গা।

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লালমামি বললেন, দক্ষিণের জানালা বন্ধ কর নবু, ভিজে যাচ্ছি।

নবুমামা বললেন, বাদশা ভাই কোথায়?

দু’দিন ধরে দেখা নেই। কোথায় কে জানে। যদি ভাল না লাগে গানটা দে। ঘুম আসছে যে আবার। ও নবু, তোর ঘুম পায় না?

শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ঘুমুতে ইচ্ছে করছিল। শুয়ে শুয়ে গান শুনতে কি ভালোই না লাগে! ক্রমে ক্রমে ঝড়ের মত বাতাসের বেগ হল। বাড়ির লম্বা থামে বাতাসের শো শো শব্দ উঠতে লাগল। ধরাম ধরাম শব্দ করে দরজা নড়তে লাগল। উঠে দাঁড়িয়েছি হ্যাঁরিকেন জ্বালাব বলে, ওমনি সফুরা খালা ডাকলেন,

রঞ্জু, ও রঞ্জু!

দরজা খুলে দেখি সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে সফুরা খালা বৃষ্টির ছাঁটে ভিজছেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, এদিকে গান হচ্ছে না-কি রঞ্জু?

হ্যাঁ, নবুমামা কলের গান বাজাচ্ছিলেন । কলের গান এনেছেন নবুমামা ।

নবু, কোথায়?

লালমামি আর নকুমামা গান বাজাচ্ছেন ।

সফুরা খালা আরো একটু এগিয়ে এসে বললেন, কই গান শুনছি না তো?

আমরা দুজন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম । সফর খালা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, রঞ্জু, আমার ভীষণ ভয় লাগছে!

১০. সেই অপূর্ব বৃষ্টিস্নাত রাত্রে

সেই অপূর্ব বৃষ্টিস্নাত রাত্রে যে ভয় করবার মত কিছু-একটা লুকিয়ে ছিল তা আমি বুঝতে পারি নি। সফুরা খালা শীতে কঁপিছিলেন, তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তবু শুধুমাত্র তার কথা শুনেই ধারণা হল, কোথাও নিশ্চয়ই ভয় লুকিয়ে আছে।

সফুরা খালা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত চলে গেলেন যেন কোন হিংস্র জন্তু তাকে তাড়া করছে। মাতালের মত বেসামাল পদক্ষেপ। আমি এসে গুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। মেঘ কেটে গেছে, রোদ উঠছে ঝকঝকে। জানোলা দিয়ে বাইরে তাকালেই মনের সব গ্লানি কেটে যায়। আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব কি-না ভাবছি, তখন নবুমামা এসে ডাকলেন, আয়, মাছ ধরতে যাই। নতুন পানিতে মেলা মাছ এসেছে।

ছিপ, কানিজাল ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে নৌকা করে চললাম দুজনে হলদাপোতা। কিন্তু নবুমামার মাছ মারার মন ছিল না। অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা বলতে লাগল। দুপুর পর্যন্ত আমরা ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম। নবুমামার ভাবভঙ্গি আমার কাছে কেমন কেমন লাগল। তিনি যেন বিশেষ কোন কারণে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিয়ের কথা বললে কিশোরী মেয়েরা যেমন পালিয়ে গিয়ে লজ্জায় লাল হয় অনেকটা সে বকম। নবুমামা বললেন, রঞ্জু, আমি আর পড়াশুনা করব না।

কেন?

ভাল লাগে না।

কি কৰবেন তবে?

ব্যবসা কৰব । দেশে দেশে ঘূৰে বেড়াব ।

নানাজান মানবে না ।

আমি কারো ধার ধারি না-কি?

বলতে বলতে নবুমামা ঈষৎ হাসলেন । দুপূৰে খাওয়ার জন্যে চিড়া আর নারিকেল আনা হয়েছিল । তা-ই খাওয়া হল । হালদাপোতা থেকে আমরা আরো উত্তরে সরে গেলাম ।

আমার আর ভাল লাগছিল না, রোদে গা তেতে উঠেছে । ইচ্ছে হচ্ছে ফিরে যাই কিন্তু নবুমামা বার বার বলছেন, একটা বড় মাছ ধরি আগে ।

সন্ধার আগে আগে প্রকাণ্ড একটা কাতলা মাছ ধরা পড়ল । সুগঠিত দেহে কালচে আঁশ বেলাশেষের রোদে ঝকঝক করছে । নৌকার পাটাতনে মাছটা ধড়ফড় করতে লাগল । দুজনেই মহাখুশি । নবুমামা খুব যত্নে বড়শি খুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল । আমি বললাম, চলুন ফিরে চলি ।

চল ।

ভাটার টানে নৌকা ভেসে চলেছে । হঠাৎ করে নবুমামার ভাবান্তর হল । আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, মাছটা ছেড়ে দেই রঞ্জু?

কেন মামা!

না, ছেড়ে দি।

বলেই মাছটা জলে ফেললেন। আমি চুপ করে রইলাম। নবুমামা বললেন, একবার আমি একটা পাখি ধরেছিলাম। টিয়া পাখি। তারপর কি মনে করে ছেড়ে দিয়েছি। আমার খুব লাভ হয়েছিল।

কি লাভ?

হয়েছিল। আজকে মাছটা ছেড়ে দিলাম! দেখিস, মাছটা দোয়া করবে আমার জন্যে।

নবুমামা পাটাতনে শুয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বাড়ি এসে হুলস্থূল কাণ্ড। লালমামির সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে সফুরা খালার। লালমামি টেনে সফুরা খালার একগোছা চুল তুলে ফেলেছেন, গাল আঁচড়ে দিয়েছেন। সফুরা খালা বিষম দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লালমামি তার দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। কারে সঙ্গে কথাবার্তা নেই। বাদশা মামা আধময়লা একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে বলছেন, সবাই যদি এলাচির সঙ্গে ঝগড়া করে তাহলে বেচারি কি কববে? কেউ দেখতে পারে না। ছোট নানীজান শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। এবার ধমকে দিলেন, যা তুই, খামাখা ঘ্যান ঘ্যান। ভাল্লাগে না।

বাদশা মামা উঠানে গিয়ে বসে রইলেন । বোকাব মত তাকাতে লাগলেন । এদিক-সেদিক । নবুমামাকে দেখে বললেন, দেখলি নবু? সফুরা কি ঝগড়া করল । এলাচির সারাদিন খাওয়া নাই ।

রাতের খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হল । রান্না হতে দেরি হয়েছে । সংসার যাত্রা কিছু পরিমাণে বিপর্যস্ত । খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমুতে এসে দেখি, সফুরা খালা বসে আছেন আমাদের ঘরে । সফুরা খালা বললেন, তোমাদের জন্যে বাইরের বাংলাঘরে বিছানা হয়েছে । এ ঘরে আমি থাকব । তাকিয়ে দেখি পরিপাটি করে ঘর সাজানো । আমার আর নবুমামার ব্যবহারিক জিনিসপত্র কিছুই নেই । নবুমামা বললেন, তুই থাকবি কেন এখানে? তোর নিজের ঘর কি হল?

আমার ঘরে পানি পড়ে, বিছানা ভিজে যায় ।

নবুমামা কিছুক্ষণ উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন । তারপর হন হন করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন । সফুরা খালা বললেন, রঞ্জু, তুমি নবুকে চোখে চোখে রাখবে ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বাদশা মামার সঙ্গে দেখা । বাদশা মামা বললেন, রঞ্জু, এলাচি ভাত খেয়েছে কিনা জানিস?

জানি না ।

মোহরের মা বলল, খেয়েছে । তুই একটু খোঁজ নিয়ে আয় ।

আপনি নিজে যান না মামা ।

আচ্ছা, আচ্ছা আমি নিজেই যাই ।

লালমামি সেদিন না খেয়ে ছিলেন । রাতেও খেলেন না, দুপুরেও ভাত নিয়ে গিয়ে মোহরের মা ফিরে এল । সফুরা খালা অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন । কিছু লাভ হল না । শেষ পর্যন্ত নানাজান আসলেন । বিরক্ত ও দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, এ সব কি বউ?

লালমামি কথা বললেন না । নানাজান বললেন,

খাও খাও, ভাত খাও ।

না, খাব না ।

সমস্ত দিন কেটে গেল । সফুরা খালা কাঁদতে লাগলেন । কি বিশ্রী অবস্থা! বাদশা মামা নৌকা করে গিয়েছে শ্রীপুরে । লালমামির মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন একেবারে ।

কানাবিবি বার বার বলে, বউ-এর কোনো খারাপ বাতাস লেগেছে, না হলে এমন হয় । মুকন্দ ওঝাকে খবর দেও না একবার ।

লালমামির মা খবর পেয়েই এসে পড়লেন । লালমামি বলল, না আমি কিছুতেই খাব না । এ বাড়িতে কিছু খাব না । আমি । নানাজান বললেন, আচ্ছা, মেয়েকে না হয় নিয়েই যান । কদিন থেকে সুস্থ হয়ে আসুক ।

ধরাধরি করে লালমামিকে নৌকায় তোলা হল। নৌকার পাটাতনে বাদশা মামা তার সুটকেস নিয়ে আগে থেকেই বসে আছেন। লালমামি বাদশা মামাকে দেখেই জ্বলে উঠলেন।

ও গেলে আমি যাব না। আল্লাহর কসম আমি যাব না।

বাদশা মামা চুপচাপ নেমে পড়ে দাঁড়িয়ে বোকার মত সবার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। যেন কিছুই হয়নি। তার কাণ্ড দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল।

১১. নবুমামার বিয়ের জন্যে

নবুমামার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সবাই। মেয়ে তো আগেই ঠিক করা ছিল। এবার কথাবার্তা এগুতে লাগল। নানাজান অনেক রকম মিষ্টি, হলুদ রঙের শাড়ি ও কানের দুল নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখতে গেলেন। সঙ্গে গেলেন হেড মাস্টার সাহেব, আজিজ আলী সাহেব। আমিও গেলাম তাদের সঙ্গে। কি মিষ্টি মেয়ে শ্যামলা রঙ, বড় বড় চোখ। এক নজর দেখলেই মন ভরে ওঠে। দেখে আমার বড় ভাল লাগল। পৌষ মাসের মাঝামাঝি দিন ফেলে নানাজান উঠে এলেন।

বাড়িতে একটি চাপা আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। সবচেয়ে খুশি সফুরা খালা। হাসি-হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সবার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে গল্প করছেন। নবুমামার কিন্তু ভাবান্তর নেই। কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। মাছ ধরতে যান। কোথাও যাত্রা টাত্রার খবর পেলে যাত্রা শুনতে যান।

গ্রামের মাঠে ফুটবল নেমে গেছে। সারা বিকাল কাটান ফুটবল খেলে। সেনটার ফরোয়ার্ডে তিনি দাঁড়ালে প্রতিপক্ষ তটস্থ হয়ে থাকে। শিল্ডের অনেক খেলা শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের টিম খুব শক্ত। ফাইন্যালে উঠে যাবে, সন্দেহ নেই। নবুমামা প্রাণপণে খেলেন। মরণপণ খেলা। বল নিয়ে দৌড়ে যাবার সময় তার মাথার লম্বাচুল বাতাসে থারথারিয়ে কাপে। মাঠের বাইরে বসে বসে মুগ্ধ নয়নে আমি তাই দেখি। রাতের বেলা গরম পানি করে আনি, নবুমামা গরম পানিতে পা ডুবিয়ে অন্যমনস্কভাবে নানা গল্প করেন। লালমামির প্রসঙ্গে কোনো আলাপ হয় না। তিনি সেই যে গিয়েছিলেন আর ফেরার নাম নেই। বাদশা মামা প্রতি হাটবারে নৌকা নিয়ে চলে যান। আবার সেদিনই ফিরে আসেন। লালমামির ঘরেই

বাকি সময়টা কাটে তার। আমি বুঝতে পারি, কোথায়ও সুর কেটে গিয়েছে। ভাল লাগে না। কবে লিলির চিঠি আসবে, কবে আমি চলে যেতে পারব, তাই ভাবি। তখন আমি অনেক স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকতে ঘেন্না বোধ হচ্ছে অথচ বেরিয়ে আসতে পারছি না। বড় নানীজান অনেক সম্পত্তি না-কি আমাকে আর লিলিকে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে আমার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তাছাড়া সে সময় আমি প্রেমেও পড়েছিলাম। অচিনপুরের এই কাহিনীতে সে প্রেমের উল্লেখ না করলেও চলে, কারণ তার ভূমিকা নেই এখানে। তবে প্রচণ্ড পরিবর্তন হচ্ছিল আমার মধ্যে এইটুকু বলা আবশ্যিক।

নবুমামার স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট হল তখন। খুবই ভাল রেজাল্ট। ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেলেন। কলেজে ভর্তি হবার জন্যে টাকা-পয়সা নিয়ে নবুমামা রওনা হলেন। নানাজানের ইচ্ছা ছিল নবুমামা যেন আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু নবুমামার ইচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজ।

নবুমামার বিয়ের তারিখ ঠিকই থাকল। নবুমামা নিজেও একদিন মেয়ে দেখে এলেন। সফুরা খালা যখন বললেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে? নবুমামা ঘাড় নেড়ে সাই দিয়েছে।

বারোই ভাদ্র তারিখে নবুমামা চলে গেলেন। আর তেরোই ভাদ্র বাদশা মামা শ্রীপুর থেকে আধ-পাগল হয়ে ফিরে এলেন। আমি ভাসা ভাসা ভাবে গুনলাম, লালমামি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার নাম করে নবুমামার সঙ্গে চলে গিয়েছেন।

কেউ যেন জানতে না পারে সেই জন্যে বাদশা মামাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। তার ঠিক নেই, কখন কাকে কি বলে বসেন। ছোট নানিজানের ফিটের ব্যারাম হয়ে গেল। সফুরা খালাকে দেখে কোন পরিবর্তন নজরে পড়ে না। শুধু তার চোখে কালি পড়েছে। মুখ শুকিয়ে তাকে দেখায় বাচ্চা ছেলের মত।

নানাজান সেই বৎসরেই হজ করতে গেলেন; যাওয়ার আগে সব সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত হল। বাদশা মামাকে সব লিখে-পড়ে দিয়ে গেলেন।

একটি প্রচণ্ড প্রাচীন বটগাছ যেন চোখের সামনে শুকিয়ে উঠেছে। সবুজ পাতা ঝরে যাচ্ছে, কাণ্ড হয়েছে অশক্ত। আমি তাই দেখছি তাকিয়ে তাকিয়ে। শৈশবের যে অবুঝ ভালবাসায় নানাজানের বাড়িটিকে আমি ঘিরে রেখেছিলাম, সেই ভালবাসা করুণ নয়নে চেয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু আমি তো এখানের কেউ নই। একদিন চুপচাপ চলে যাব। কেউ জানতেও পারবে না রঞ্জু নামের আবেগপ্রবণ ছেলেটি কোথায় চলে গেল।

এ বাড়ির সব কিছুই বদলে গেছে। লাল ফেজটুপি পরা নানাজান সূর্য উঠার আগেই উঠানের চেয়ারে এসে আর বসে না। “ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বি কুমা তুকারজিবান” ঘুম-ঘুম চোখে অর্ধ-জাগ্রত কানে কতবার শুনেছি এই সুর। এখন সকালটা বড়ো চুপচাপ।

ভোরের আলোয় মনের সব গ্লানি কেটে যায়। আমি চাই এ বাড়ির সবার মনের গ্লানি কেটে যাক। নবুমামা ফিরে এসে আগের মত জোছনা দেখে উল্লাসে চিৎকার করুক। কি জোছনা! খেতে ইচ্ছে করে। সফুরা খালা ঠিক আগের মত লাঠি হাতে পাখি উড়ে গেল বলে এ সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট উড়িয়ে দিক। বাদশা মামা তার সাজ-পোশাক পরে হিরণ্য

ইমামুন্ আহমেদ । অটিনপুর । উপন্যাস

রাজার পাঠ করুক । কিন্তু তা আর হবে না, তা হবার নয় । আমি সংসারের মস্তুর শ্রোতে
গা এলিয়ে দিলাম । কারো সঙ্গেই আজ আমার যোগ নেই । দিন কেটে যেতে লাগল ।

১২. টিনের কানেশ্তারায় বাড়ি পড়েছে

টিনের কানেশ্তারায় বাড়ি পড়েছে। উচ্চকণ্ঠে কি যেন ঘোষণা করা হচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে দাঁড়াতেই দেখি, বাদশা মামা বিব্রত মুখে সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে হাঁটছেন। তার আগে আরেকজন টিনে বাড়ি দিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে কি বলছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার মামা?

কিছু না, কিছু না।

টোল দিচ্ছে কে? আপনি নাকি?

হুঁ।

কিসের জন্যে?

বাদশা মামা দাঁড়িয়ে পড়লেন। জড়িত কণ্ঠে বললেন, রহমত পাগলের জন্যে টোল দিচ্ছি, যদি কেউ পায় তাহলে পাঁচ টাকা পুরস্কার।

কেন, কি হয়েছে?

বাদশা মামা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু আমি ততক্ষণে তার হাত চেপে ধরেছি। মামা অসহায়ভাবে তাকালেন আমার দিকে। আমি দৃষ্ট গলায় বললাম, বলেন কি ব্যাপার।

রঞ্জু, পাগলটাকে খেদিয়ে দেবার পর থেকে যত অশান্তি শুরু হয়েছে। ফিরিয়ে আনলে যদি সব মিটে।

মামা আমার হাত ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। বাদশা মামা আরো অনেক রকম পাগলামি করতে লাগলেন। নানাজানের একটি আম-কাঁঠালের প্রকাণ্ড বাগান ছিল। জলের দরে সেটি বেঁচে দিলেন। বিক্রির টাকা দিয়ে নাকি মসজিদ করবেন। ছোট নানীজান কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, এসব কী রে বাদশা?

বাদশা মামা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন, তিনি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন সাদা পোশাক পরা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাকে বললেন, মসজিদ কর, সব ঠিক হবে। ছোট নানীজান বললেন, বাদশা, তুই মিথ্যা কথা বলছিস। বাদশা মামা মাথা নিচু করে চলে গেলেন। মসজিদের জন্য ইট পুড়ানো হতে লাগল। ময়মনসিংহ থেকে রাজমিস্ত্রি আসল। বিরাট মিলাদ মহফিলের মধ্যে মসজিদের কাজ শুরু হল।

নানাজানের দুটি বিল ছিল। বিলের মাছ থেকে পয়সা আসত বিস্তর। সেই টাকায় সংসার খরচ গিয়েও বেশ মোটা অংশ জমত। বিল দুটি একইসঙ্গে হাতছাড়া হয়ে গেল। কী ভাবে হল কেউ বলতে পারল না। নানীজান সারাদিন চোখের পানি ফেলতে লাগলেন।

রহিম শেখ একসঙ্গে বেশ কয়েকটি মামলা রুজু করল। সমস্তই মিথ্যা মামলা। বাদশা মামা নির্বিকার বসে আছেন মসজিদের সামনে। দেখছেন কী করে ইটের পর ইট বিছিয়ে ভিত তৈরি হচ্ছে। মামলার তদবীরের জন্য ছোট নানীজানকে নিয়ে আমিই যাওয়া-আসা করতে লাগলাম। দীর্ঘদিন মামলা চলল। দুটিতে জিত হল আমাদের, একটি রহিম শেখ পেল।

নানাজান হজ থেকে ফিরে এলেন এই সময়ে। সংসারের তখন ভরাডুবি ঘটেছে। রোজকার বাজারের টাকাতেও টানাটানি পড়তে শুরু করেছে। নানাজান কিছুই বলল না। ছয় মাসেই

তার বয়স ছবছর বেড়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি হয়েছে নিম্প্রভ, একা একা হাঁটতে পারেন না। লাঠিতে ভর না দিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। চোখের সামনে সংসারকে ভেঙে পড়তে দেখলেন। তবু সকালেবেলায় কোরাওন শরীফ ধরে বিলম্বিত সুরে পড়তে লাগলেন। “ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বিকুমা তুকা জিবান।” অতএব তুমি আমার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে?

বৎসর যাবার আগেই সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দিতে হল। বাদশা মামার মসজিদ ততদিনে শেষ হয়েছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে চমৎকার নকশি কাটা গম্বুজ। ধবধব সাদা দেয়ালে নীল হরফে লেখা কলমায়ে তৈয়ব। পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমপারা হাতে সকালবেলাতেই মসজিদে ছবক নিতে আসে। দেখে-শুনে বাদশা মামা মহাখুশি। মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে মসজিদের সামনে পুকুর কাটিয়ে দিলেন। কি সুন্দর টলটলে জল, পুকুরে পাথরে বাঁধানো প্রশস্ত ঘাট।

বাদশা-মামাকে দেখে আমার নিজেরও ভাল লাগে। সাদা গোল টুপি পরে চোখে সুরমা দিয়ে কেমন গর্বিত ভঙ্গিতে নামাজ পড়তে যান। একদিন আমাকে ডেকে একটু ইতস্তত করে বললেন, রঞ্জু, জুমার রাতে তাহাযতের নামাজ পড়ে শুয়েছি, আমনি দেখি তোর লালমামি যেন নৌকায় করে ফিরে আসছে। আসবে ফিরে, দেখিস তুই। বাদশা মামার চোখ আনন্দে চকচক করে।

লালমামির কথা ভাবতে চাই না আমি। তবু বড়ো মনে পড়ে। কে জানে কোথায় সংসার পেতেছে তারা; নাকি যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশময়? কোনোদিন কী সত্যি ফিরে আসবে ধসে যাওয়া পরিবারটিকে শেষবারের মত দেখে যেতে?

নিজের কথাও আজকাল খুব ভাবি। আজন্ম যে রহস্যময়তার ভেতর বড় হয়েছি তা সরে সরে যায়। মনে হয় কিছুই রহস্য নয়। চাঁদের আলো, ভোরের প্রথম সূর্য সমস্তই রহস্যের অতীত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী। যে নিয়মের ভেতর আমরা জন্মাই, বড় হই, দুঃখ-কষ্ট পাই। দুঃখ ও সুখ, কী তা নিয়েও ভাবতে চেষ্টা করি; মোহরের মা যখন তার আজীবন-সঞ্চিত পটুলা-পুটলি নিয়ে অশ্রুসজল চোখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, ও ব্যাটা রঞ্জু যাই গো ব্যাটা। তোমার দুঃসময়ে একটা মানুষের বোঝা আর বাড়াইতাম না গো। তখন আমার কোন দুঃখবোধ হয় না। এ যেন ঘটতই। তাহলে দুঃখ কী? নতুন করে আবার সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে শুনে ছোট নানীজান যখন উন্মাদের মত কাঁদেন তখন বুঝি এই দুঃখ, অথচ সফুরা খালা তখন হাসিমুখে বলেন, গরিব মানুষ হওয়ার অনেক রকম মজা আছে রঞ্জু, তুমি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারবে কেউ কিছু বলবে না। তখন সব ভাবনা-চিন্তা জট পাকিয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা আমি নানাজানের হাত ধরে তাকে বেড়াতে নিয়ে যাই। হিম গেলে তাঁর কাশি হয়। খুক খুক করে কাশেন। আমি যদি বলি, চলেন ঘরে যাই। নানাজান আঁৎকে ওঠেন, না, না, আরেকটু, আরেকটু, বেড়াই। পরম নির্ভরতার সঙ্গে তিনি আমার হাত ধরে হাঁটেন। বেলাশেষের সূর্যরশ্মি তার সফেদ দাড়িতে চকচক করে।

১৩. লিলির ঐ চিঠির জন্যে

লিলির যে চিঠির জন্যে পরম আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিলাম, সে চিঠি এসে গেছে। লিলি গোটা গোটা হরফে লিখছে, আমি জানি তুই রাগ করেছিস। কতদিন হল গিয়েছি কিন্তু কখনো তোর কাছে চিঠি লিখিনি। কি করব বল? এমন খারাপ অবস্থা গেছে আমার। তোর দুলাভাইয়ের চাকরি নেই। বসতবাটিও পদ্মায় ভেঙে নিয়েছে। একেবারে ভিক্ষা করবার মত অবস্থা। কতদিন যে মাত্র একবেলা খেয়েছি। তারপর আবার তোর দুলাভাইয়ের অসুখ হল। মরো-মরো অবস্থা। এখন অবশ্যি ঠিক হয়ে গেছে সব। তুই অতি অবশ্যি এসে যা রঞ্জু।

লিলির চিঠি পকেটে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই। সবাইকে ছেড়ে যেতে বড় মায়া লাগে। আশৈশব পরিচিত এ বাড়িঘর। বাদশা মামা, নানাজান, লালমামি, নবুমামা এদের সবার স্মৃতির গন্ধ নিয়ে যে বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তাকে ছেড়ে কী করে যাই? আমি উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সোনাখালির পুলের উপর অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকি। নৌকা নিয়ে চলে যাই হলদিপোতা। খুব জোছনা হলে সফুরা খালাকে নিয়ে পুকুরঘাটে বেড়াতে চাই। সফুরা খালা বলেন, তুমি কবে যাবে রঞ্জু?

যে কোনো একদিন যাব।

সেই যে কোনো একদিনটা কবে?

হবে একদিন।

একেক রাতে সফুরা খালা কাঁদেন । তার গভীর বিষাদ বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই । বুঝতে চাই না । যে বন্ধন আমাকে এখানে আটকে রেখেছে কবে তা কাটবে, কবে চলে যাব, তাই ভাবি । নানাজানও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন,

তোমার যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে?

না ।

তোমার আর লিলির নামে যে জমি-জমা আছে তার কী হবে?

যেমন আছে তেমন থাকবে ।

নানাজান কথা বললেন না । আমি জানি এই জমিটুকুই তাদের অবলম্বন ।

সে রাতে ভীষণ শীতই পড়েছিল । সন্ধ্যা না নামতেই ঘন কুয়াশা চারদিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল । রাতের খাওয়ার পর হ্যারিকেন হাতে বাইরের ঘরে আসছি, হঠাৎ দেখি মামা দারুণ উত্তেজিত হয়ে দ্রুত আসছেন । আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন ।

রঞ্জু, দেখ দেখি ।

আমি তাকিয়ে দেখলাম একটু দূরে, লালমামি একটি বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, বাদশা মামা বলে চলেছেন, নৌকা করে সন্ধ্যার আগেই এরা দুজন এসেছে । চুপচাপ বসেছিল । আমি মসজিদে যাব বলে ওজু করতে গিয়েছি । এমন সময়...

লালমামি বাচ্চা মেয়েটির হাত ধরে উঠানে এসে দাঁড়ালেন (যে উঠানে অনেক অনেক দিন আগে আমার মা তার দুটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন)। কেউ কোনো কথা বলল না। নানাজান চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট নানীজান যেন কিছুই বুঝছেন না। এমন ভঙ্গিতে

তাকাতে লাগলেন। সফুরা খালা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি নিচে নেমে এলেন। বাদশা মামা ব্যস্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর গরম শালটা কোথায় সফুরা? এলাচির শীত করছে।

নবুমামার কথা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। সবাই চুপ করে রইল। এক সময় দেখলাম লালমামি কাঁদছেন।

আমি চুপচাপ বাইরের ঘরে বসে বসে ঝিঝি ডাক শুনতে লাগলাম। অনেক রাতে বাদশা মামা আমাকে ডেকে নিলেন। মৃদু ভৎসনার সুরে বললেন, তোরা সবাই যদি দূরে দূরে থাকিস তাহলে এলাচি কী মনে করবে বল? চল রঞ্জু।

বাদশা মামা আমার হাত ধরলেন।

বহুদিন পর লালমামির ঘরে এসে ঢুকলাম। পালঙ্কে লালমামি আধশোয়া হয়ে আছেন। তার কোলের কাছে কুণ্ডলি পাকিয়ে বাচ্চা মেয়েটি ঘুমিয়ে। আমি এসে বসতেই লালমামি একটু সরে গেলেন। আমি বললাম, কেমন আছেন মামি?

মামি মাথা নাড়লেন । বাদশা মামা বললেন, মোটেই ভাল না রঞ্জু । দেখ না স্বাস্থ্য কী খারাপ হয়ে গেছে । আমি চুপচাপ বসে রইলাম । বাদশা মামা ব্যস্ত হয়ে পুরোনো গ্রামোফোন খুঁজে বের করলেন ।

আমি বললাম—

আজি থাক মামা ।

না-না শুনি । আমার শোনার ইচ্ছা হচ্ছে ।

লালমামি মৃদু কণ্ঠে বললেন, না-না থাকুক । গান বাজাতে হবে না ।

তবু গান বেজে উঠল—

“আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো
তোরে আমি কোথায় রাখি বল ।”

আমি চলে আসলাম । এই অচিনপুরীতে থাকবার কাল আমার শেষ হয়েছে ।